লাউডস্পিকার

সা'দত হাসান মান্টো

গাঞ্জে ফেরেশতে

দ্বিতীয় খণ্ড

শুভম

লাউডস্পিকার

গাঞ্জে ফেরেশতে ২য় খণ্ড

লাউডস্পিকার

গাঞ্জে ফেরেশতে ২য় খণ্ড

সা'দত হাসান মান্টো

দুষ্প্রাপ্য বই/ Rare Collection

অনুবাদ ও সম্পাদনা
মোস্তফা হারুণ

বইটি সাবধানতা এবং মমতার
সাথে ব্যবহার করুন।

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং- T-33
বই এর ধরন- অনুবাদ-গল্প

স্টুডেন্ট ওয়েজ
বাংলা বাজার, ঢাকা

LOUD SPEAKER (Ganje Fereste 2nd Part)
A Biography on great Film Personalties by Sadat Hasan Mantoo. Translated and edited by Mustafa Haroon. Published by Mohd. Liaquatullah, Student Ways. Bangla Bazar, Dacca, April, 1978. Price: Taka Ten only

---

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৩৮৫
এপ্রিল, ১৯৭৮

প্রকাশক
মোহাম্মদ লিয়াকতউল্লাহ
স্টুডেন্ট ওয়েজ
৯, বাংলা বাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
সৈয়দ লুৎফুল হক

মুদ্রণে
ইফতেখার রসুল জর্জ
প্রান্তিকা মুদ্রণী
৪৩, দীননাথ সেন রোড, ঢাকা-৪

(স্বঃ) জাহানারা হারুণ

মূল্য ঃ মাত্র দশ টাকা

সূচীপত্র

আমার কথা ঃ মান্টো
কুলদীপ কাউর
আনোয়ার পাশাঃ বাপকা গুনাহ
নৃত্যপটিয়সী সেতারা
ব্লাক মেলার দেওয়ান সিং মফতুন
নীনা
রফিক গজনভী
তিন গুলি ঃ বিন্দু থেকে বৃত্ত

উৎসর্গ—

রাহাত খান

নিবেদন

মান্টোর 'লাউডস্পীকার' অবশেষে পাঠকদের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হলো। চলচ্চিত্র নগরীর উপাখ্যান খ্যাত গাঞ্জে ফেরেশতের পরবর্তী অধ্যায় হিসাবে পরিচিত এই বইটির রচনাকাল এবং তৎকালীন মান্টোর মানসিক অবস্থা ছিল ভিন্নতর, এজন্যে গাঞ্জে ফেরেশতের সাথে এই বইয়ের মেজাজগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু দু'টো বইয়েরই দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যে কোন বিভিন্নতা নেই। সাহিত্য, শিল্প ও চলচ্চিত্র নগরীর লোকদের মেকীমন ও বিচিত্র জীবনধারা তুলে ধরাই এর আসল উদ্দেশ্য।

এ দেশে একটি বই ছাপা শুরু হলে তা শেষ হতে একাধিক বছর লেগে যায়, সেই তুলনায় প্রকাশক ও মুদ্রাকর বন্ধুবর মোহাম্মদ লিয়াকতউল্লাহ ও ইফতেখার রসুল জর্জের আন্তরিকতায় বইটি স্বল্প সময়েই বের হল। এই বইটির অংশ বিশেষের প্রাথমিক অনুবাদের বেলায় অগ্রজ কাজী মাসুম কিছুটা সহযোগিতা দান করেছেন। এজন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। বইটির অনুবাদের উৎকর্ষ ও সামগ্রিক সৌষ্ঠব সম্পর্কে সহৃদয় পাঠকরা যদি আমাদের অবহিত করেন বিশেষ বাধিত হবো।

মোস্তফা হারুণ
বি ৭৫/জি-৮,
মতিঝিল কলোনী, ঢাকা

১লা বৈশাখ ১৩৮৫ বাং

আমার কথা

'ঠাণ্ডাগোস্ত'-এর মামলা প্রায় এক বছর চলেছিল। নিম্ন আদালতে আমাকে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং তিনশ' টাকা জরিমানা করেছিল। সেসনে আপিল করার পর মুক্তি পেলাম। (এর পরও সরকার আমার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করে রেখেছে যার এখনো শুনানী হয়নি।)

এ সময় আমার দিনগুলো কিভাবে কেটেছে তার কিছুটা আভাস আপনারা 'ঠাণ্ডাগোস্ত'-এর ভূমিকাতে পাবেন। মনের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কি করব ভেবে কুল কিনারা পেলাম না। লেখা ছেড়ে দোব কিনা তাই ভাবছিলাম। সত্যি বলতে কি, মন এত তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছে যে, ইচ্ছে হচ্ছে কোন কিছুর একটা এলট-ম্যান্ট হলে লেখার চর্চ্চাটা ছেড়ে দিয়ে কিছুকাল নিরিবিলি জীবনটা কাটাব। এরপর মনে কোন লেখার ঝোঁক চাপলে তাকে ফাঁসি দোব। এলটম্যান্ট না হলে ব্লাক মার্কেটিং অথবা বে-আইনী মদের কারবার করব কিনা তাও ভাবছিলাম। শেষোক্তটি এজন্যে সম্ভব নয় যেহেতু আমি ভয় করতাম, পাছে সব মদ নিজেই না পান করে ফেলি। আর ব্লাক মার্কেটিং করতে হলে মেলা টাকার দরকার। সুতরাং তাও সম্ভব না। একমাত্র এলটম্যান্টটাই হলে হতে পারে। আপনারা আশ্চর্য হবেন, এ সব আমি সত্যি সত্যি করতে চেয়েছিলাম। অতঃপর বাধ্য হয়ে নিজের গাঁট থেকে নগদ টাকা সরকারের তহবিলে গচ্চা দিয়ে দরখাস্ত করলাম। বললাম, আমি অমৃতসরের মোহাজের। বেকার অবস্থায় আছি। দয়া করে কোন প্রেস অথবা সিনেমার কিয়দংশ আমার নামে এলটম্যান্ট করার আজ্ঞা হোক।

দরখাস্তের ছাপানো ফর্মে আজব ধরনের প্রশ্নাবলী ছিল। প্রত্যেক প্রশ্ন এমন যে, উত্তরদাতাকে প্রচুর মিথ্যা কথা বলতে হবে। কিন্তু এ অভ্যাস আমার প্রথম থেকেই ছিল না। আমি এ ব্যাপারে অনেক ঝানু লোকদের সাথে পরামর্শ করলাম। তারা বলল, তোমাকে মিথ্যা বলতেই হবে। অবশ্য যখন ফরম পূরণ করতে বসলাম তখন শতকরা দুই তিন আনার বেশী মিথ্যা বলতে পারিনি।

যখন ইন্টারভিউ হল, আমি তাদেরকে সাফ সাফ বললাম, আসলে দরখাস্তে যা লেখা আছে তার সবকিছুই মিথ্যা। সত্য হলো, আমি ভারতে এমন বেশী কিছু সম্পত্তি রেখে আসিনি। শুধুমাত্র একটা বাড়ী ছিল। আমি আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি না। আমার মতে আমি একজন মস্তবড় গল্প লেখক। কিন্তু এখন বুঝলাম, এ কাজ আমাকে পোষাবে না। খোদা এম. আসলাম এবং ভারতী দত্তকে সুখে রাখুন। গল্প-গুরু হিসাবে আমি তাদের পায়ে মাথা নত করি। এখন চাচ্ছি সরকার আমাকে এমন একটা এলটম্যান্ট দিক যার বদৌলতে আমি কাজ করে দিব্যি মাসে পাঁচ ছ'শ' টাকা রোজগার করতে পারি।

আশ্চর্য যে, আমার কথায় তাদের সুমতি হল। কোন একটা বরফের ফেক্টরীর এলট্ম্যান্ট প্রায় পেয়েও যাচ্ছিলাম এমতাবস্থায় কে একজন বলল, এ তোমরা কি করছ? এ লোকটি, যার নাম সা'দত হাসান মান্টো—নেহাতই বামপন্থী লেখক। অবশেষে আমার দরখাস্ত নাকচ করে দিল।

এদিকে এ ব্যাপার হলো, আবার ওদিকে প্রগতিশীল লেখকরা আমাকে রক্ষণশীল বলে আমার অন্নজল সব বন্ধ করার ব্যবস্থা করল। বেশ মজা হ'ল। অনেক ভেবে চিন্তে আবার কলম হাতে নিলাম। কিন্তু কি লিখব তা নিয়ে চিন্তা করলাম। অনেক চিন্তার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম, আমার জানা শুনা চিত্র তারকাদের সম্পর্কে কিছু লিখি। এটা কিছু নিরাপদ হবে।

প্রথমেই 'পরীরানী নাসিম বানু' সম্পর্কে লিখলাম। দৈনিক 'আফাকে' ছাপা হলো। ভাবলাম বেশ একটু পথ খুলে গেল। এবার আর সরকারের কোন মাথাব্যথা থাকবে না। পাঠকদের মধ্যেও সহজেই সাড়া পড়ে যাবে। কিন্তু এটা ছাপা হবার পরই দেশময় একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। আমাকে গালাগালি করে অনেক চিঠি এলো পত্রিকা অফিসে।

৩রা জুলাইর আফাকে কাজি এম. বশির মাহমুদ সাহিত্যরত্নের চিঠি ছাপা হলো। তাতে লেখা ছিল:

"সা'দত হাসান মান্টোর লিখিত 'পরীরানী নাসিম বানু' পড়লাম। এবং সেই সাথে ভাইকে লিখিত নাসিম বানুর চিঠিও পড়লাম।

মান্টো বড় মুন্সিয়ানা করে বোনটির দোষ-গুণ, এটাসেটা এবং ব্যক্তিগত কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মনে হয় তিনি বোনটির ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে অনেক সত্য কথা জেনেও এড়িয়ে গেছেন। এটা নিঃসন্দেহে তাকে অপমান করার শামিল।

এভাবে লিখতে গিয়ে একটু আড়াল অবডাল বা সংযমের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি। তাঁর ভাষা বা বাক্য-বিন্যাসের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। তবে আমি জিজ্ঞেস করি, নাসিম বানু কি মান্টোর আপন বোন? মান্টো তার প্রেম ইত্যাদি সম্পর্কে লিখবার মত শক্তি বা সাহস রাখেন কি করে?

মান্টো অত্যন্ত দুষ্টু। আমি তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করি। আমি তাঁর বহু সাহিত্যকর্ম দেখেছি। কিন্তু এবারে যা দেখলাম একেবারে আশাহত। আমি মান্টো বন্ধুর 'নাসিম বানু' সম্পর্কে কোন অভিমত পেশ করছি না। তাছাড়া সমালোচনাই বা আমি কি করতে পারি? সে পর্যন্ত পৌঁছতে আমার এখনো অনেক বাকী।"

এ চিঠি পড়ে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তা দূর করার জন্যে আমি আবার কিছু লিখে সরোয়ার সাহেবকে দিলাম।

এ চিঠির প্রতিবাদে আরো চিঠি এলো। আরো অনেক বাদ-প্রতিবাদ চলল।

সরোয়ার সাহেব এদিকে আমল না দিয়ে আমাকে বললেন, 'তুমি লিখতে থাক। বেশ মজার বিষয়। কারো কথা না শুনে তুমি লিখে যাও।'

আমি তাঁর কথা মত লিখে যেতে লাগলাম। আর মানুষের অভিসম্পাত এবং পত্রবৃষ্টিও পড়তে লাগল দেদার। এরপর যেবারে 'শ্যাম' সম্পর্কে লিখলাম, শিয়ালকোট থেকে নাইয়ার বানু নাম্নী এক মহিলার বিরাট চিঠি পেলাম। তা পড়ে আমি অবাক হলাম। তার কিয়দংশ এখানে দিলাম।

'আমি সিনেমা দেখাকে 'কবিরা গুনাহ' মনে করি না। ছবি দেখলেই চোখে কাপড় বেঁধে পালিয়ে যাই না। কিন্তু আমার ছেলেমেয়ে আছে। আমি চাই তারা ভালো হোক। সিনেমা দেখে চরিত্র গঠন হয়না। বরং নষ্ট হয়। এ জন্যে আমি সিনেমা দেখা ছেড়ে দিয়েছি। আমি গেলে তারাও যাবে। তাদেরকে নিরস্ত করা যায় না।

আমি এত বড় হয়েছি। এখনো এমন অনেক ছবি আছে যা দেখলে মন বড় খারাপ হয়ে যায়। তখন এমন খারাপ লাগে, মনে হয় কারো নগ্ন অবস্থায় আমি সেখানে বিনা অনুমতিতে ঢুকে যাচ্ছি। আর এটা নিঃসন্দেহে শালীনতা বিরুদ্ধ। আপনি বলবেন, এসব ছবির বই-পুস্তক পত্রিকা বাচ্চাদের নাগালে না রাখলেই তো হয়। কিন্তু এটা কতক্ষণ সম্ভব? এসব পড়াশুনা করে আর আলমারীতে তো বন্ধ করে রাখা সম্ভব নয়।

'মুরলীর ধ্বনি' আবার একটু পড়ে বলুনতো এটা কোন ধরনের? একটা লোক যত বড় পাপীই হোক না কেন, এ লেখা ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে কি করে সে পড়বে? সে যত বড় মদ্যপায়ীই হোক বা বেশ্যা বাড়ীতে পড়ে থাকুক বা হাজারো অনাচার করুক, সে যখন মনে করবে 'মাগী কোথায়'? এবং না পেলে বিছানা জ্বালিয়ে দেয়, তখন কেমন লাগে? এটা কোন ধরনের মনুষ্যত্ব। এসব জিনিস খবরের কাগজের মারফতে ছড়ানোর কি মানে আছে?

সবারই ঘর সংসার আছে, ছেলে সন্তান আছে। এদের ধ্যান-ধারণা ঘর-সংসার এবং ছেলেপিলের পরিবেশ মাফিক হওয়া দরকার। সারা-জগৎ তো আর পুরুষের জন্যেই বরাদ্দ নয় যে, যা তা করে বেড়াবে। নিজেরা তো অধঃপাতে যাচ্ছেই, সেই সাথে নিষ্পাপ শিশু-সন্তানদেরকেও সেদিকে টেনে নিচ্ছে। ঘর ছেড়ে পালানোর দশা হয়েছে এখন। এখন উচিত হচ্ছে পুরুষদের হাতে সন্তান প্রতিপালনের ভার দেয়া। তখন বুঝবে মজাটা। তখন বাপ ছেলেকে শিখাবে কি করে মদমত্ত হয়ে 'শালী মাগী' বলে মেয়েদেরকে টেনে নিয়ে যেতে হয়। তওবা, তওবা—কি মনুষ্যত্ব—কি সমাজ?

আমি এ চিঠি পড়ে সত্যি দুঃখিত হলাম। আর যা-ই করেছি আর না করেছি, নাইয়ার বানুর প্রতি আমি অবিচার করেছি। তার অবস্থা দেখে আমার খুব দরদ হলো। আমাকে এর প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। আবার ভাবলাম, সত্যিকার অর্থে যেভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা যদি করি, তাহলে (এ মহিলা যেহেতু কোন কোন ছবি দেখে মনে করেন কারো নগ্ন অবস্থায় বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়েছেন) এ মহিলা হয়ত তা সহ্য করতে পারবেন না। এমনও হতে পারে যে, তিনি মরে যাবেন।

আমি এব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত, নাইয়ার বান মানসিক রোগ গ্রস্তদের মধ্যে যে পর্যায়ভুক্ত তাদের প্রতি মানুষের করুণা করা উচিত। তার চিকিৎসা সম্পর্কে যতটুকু আমি মনে করি তাহলো, তার সামনে বোতলের মুখ খুলে মদের উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে, মাথায় কাদা মেখে, মুখে গালি গালাজের তুবড়ী ছুটিয়ে মাতলামী করতে হবে। প্রয়োজন হলে এ কাজ যদি নিজে না পারা যায় লোক ভাড়া করতে হবে। এরপর শামা, বিশবি সদি, রুমান এবং এ ধরনের নানান পত্রিকার লেখাগুলো বিজ্ঞাপন সমেত জোরে জোরে পড়ে তাকে শুনাতে হবে। এভাবে যদি তার রোগমুক্তি না হয়, তাহলে সা'দত হাসান মান্টোকে যেন বলা হয়, নাইয়ার বানুর পুরনো সেণ্ডেল এনে নিজের মাথায় মেরে নাইয়ার বানুর পূত পবিত্রতাকে উদ্ধার কর।

আমি অনেক চিন্তা করে এই বইর নাম 'গাঞ্জে ফেরেশতে' রেখেছি। যথার্থভাবে এ বইর জন্যে এ নাম প্রযোজ্য (গাঞ্জে ফেরেশতের অর্থ দাঁড়ায় নিষ্পাপ ফেরেশতের দল)।

এরপর 'তিন গুলে' যখন ছাপা হলো, খাজা ফরখান্দা বুনিয়াদী নামক জনৈক ব্যক্তি 'আফাক'-সম্পাদকের নামে এক চিঠিতে জানাল যে,

আপনি 'আফাকে'র সাহিত্য সংখ্যায় সা'দত হাসান মান্টোর 'তিন গুলে' ছেপে মিরাজী মরহুম মান্টো সাহেব এবং 'আফাকে'র সাথে অবিচার করেছেন। প্রবন্ধগুলো কোন বিশেষ মহলের জন্য অবশ্য সুপাঠ্য। কিন্তু একটা রুচিশীল পত্রিকায় এটা ছাপানো মোটেই উচিত হয়নি কিন্তু।

পৃথিবীর প্রায় সভ্য দেশেই এই রীতি প্রচলিত আছে, মানুষ মারা গেলে দুশমন হলেও সম্মান সহকারে তার কথা বলতে হয়। তার দোষ ঢেকে গুণগুলো বলতে হয়। মিরাজীর মধ্যে যদি কোন দুর্বলতা থেকেও থাকে তার বিশেষ বন্ধুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যথায় সবাই তাকে একজন বড় কবি এবং সাহিত্যিক হিসেবেই জানতো। কি আশ্চর্য, তার এক বন্ধু তার মৃত্যুর পর তার সব দোষগুলো জনসাধারণের সমনে বিশ্রী ভাষায় তুলে ধরছে।

ইসমত যেমন 'দোজখী' লিখে নিজের ভাইর গুণ কীর্তন প্রকাশ করেছে, আমাদের লেখকরাও আজকাল সে পথ অনুসরণ শুরু করে চলছে। আর বিশেষ করে এই লেখার ভাষা এত অশ্রাব্য—নগ্ন এবং অশ্লীল যে, রীতিমত তওবা পড়তে হয়। যাদের শালীনতাবোধ আছে তারা এসব কি করে পড়বে? এ প্রবন্ধ ঘরের বৌ-ঝি মায় ছেলে-মেয়ে কেউ পড়তে পারে না। মান্টোকে ছাড়া আপনার সাহিত্য সংখ্যা কি অসম্পূর্ণ থাকত?

মরহুম মিরাজী, মান্টো এবং 'আফাকে'র উপর যে জুলুম হবার ছিল তাতো হয়েই গেল। তারপর এ সংকলন প্রকাশের পর আরো যে সব জুলুম হবে তার পাপ-পুণ্য আমার মাথায় পেতে নিলাম। আর এ পাপ বুনিয়াদী সাহেবের কথাকে সামনে রেখেই আরম্ভ করলাম। তিনি লিখেছেন, 'সভ্য সমাজে মানুষ মারা গেলে দুশমন হলেও সম্মান সহকারে তার কথা বলতে হয়। দোষগুলো রেখে গুণগুলো বলতে হয়।'

এমন সমাজ এবং সভ্যতার উপর হাজার বার অভিসম্পাত, যেখানে মানুষ মারা গেলে তাদের কৃতকর্মের সত্তার লণ্ড্রিতে পাঠিয়ে খুব সাফ সাফাই করে ধোলাই করা হয় এবং অতঃপর বিধাতার জন্যে টানিয়ে দেয়া হয়।

আমার প্রসাধন কক্ষে কোন প্রসাধন দ্রব্য নেই ভাই। না আছে এখানে কোন শ্যাম্পু, না আছে পাউডার স্নো, না আছে চুল বানাবার কোন মেশিন। আমি সাজগোজ করতে জানি না। প্রসাধন করে আসল চেহারা ঢাকতে জানি না। 'আগা হাশর'-এর সিক্ত নয়নযুগলকে আমি সাদা চোখে দেখতে পারি না। তার মুখ থেকে গালিগালাজ ছাড়া ফুল ঝরাতে পারিনা। মিরাজীর ভ্রষ্টতাকে আমি ইস্ত্রি করতে পারিনি। বন্ধু শ্যামকে আমি বাধ্য করতে পারিনা সে অন্য মেয়েদেরকে 'শালী' না বলুক। এ পুস্তকে যে সব ফেরেশতাদের সমাবেশ—নিঃসন্দেহে তাদের মাথা মুড়ানো হয়েছে এবং এ কাজে আমি এতটুকুও শিথিলতা করিনি।

—সা'দত হাসান মান্টো
লাহোর, ১১ই জানুয়ারী' ৫২ ইং

লাউডস্পিকার ।। গাঞ্জে ফেরেশতে ২য় খণ্ড

কুলদীপ কাউর

কুলদীপ বিখ্যাত অভিনেত্রীর নাম, যিনি হিন্দুস্তানের অনেক ছবিতে অভিনয় করেছেন। আর আপনিও হয়তো তাঁকে রূপালী পর্দায় দেখে থাকবেন। আমি সিনেমার বিজ্ঞাপনে যখনই তার নাম দেখি তখন প্রথমেই তার নাকটা আমার নজরে আসে আর চেহারাটা আসে তারপরে। তার নাকটা খুব তীক্ষ্ণ—এ প্রসঙ্গে বোম্বে টকিজের সেই মজার গল্পটা মনে পড়ছে আমার —সেটা বলি।

বিভাগোত্তর কালে পাঞ্জাবে যখন রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা শুরু হয় তখন কুলদীপ লাহোর থেকে বোম্বে চলে যায়। সে লাহোরে ছবিতে অভিনয় করতো। তার সাথে তার রক্ষিত প্রাণও ছিল। প্রাণ লাহোরের পঞ্চোলী ফিল্ম কোম্পানীর ছবিতে অভিনয় করে বেশ খ্যাতি লাভ করেছিল।

যখন প্রাণের কথা এসেই পড়ল তখন তার পরিচিতিটাও দেয়া যাক। প্রাণ বেশ সুন্দর চেহারার লোক। লাহোরে তার খ্যাতি ছিল এজন্য যে, সে সবচে' ভালো জামাকাপড় পড়তো। আর বেশ ঠাঁটের সাথে থাকতো। তার টাঙ্গা ঘোড়া লাহোরের নবাবদের টাঙ্গা ঘোড়ার চেয়েও সুন্দর ও দামী ছিল।

তবে জানিনা কখন থেকে কুলদীপের সাথে প্রাণের মুহব্বত চলছে, আর কিভাবে চলছে। কারণ, আমি তখন লাহোরে ছিলাম না। তবে ফিলিম দুনিয়ার প্রেম-মহব্বত কোন নতুন ঘটনা নয়। অনেক সুটিং-এর সময় কোন অভিনেত্রী কর্মরত কয়েকজন পুরুষের সাথে একই সঙ্গে মুহব্বত করে থাকে।

যখন থেকে প্রাণ ও কুলদীপের প্রেম নিবেদন চলছিল তখন পরলাকগত শ্যামও সেখানে ছিল। পুণা ও বোম্বেতে ভাগ্য পরীক্ষার পর শ্যাম লাহোরে চলে আসে। তার সাথেও কুলদীপের প্রগাঢ় প্রেম ছিল। শ্যাম ছিল পেশাদার প্রেমিক। আর কুলদীপও এ ক্ষেত্রে পিছপা ছিল না। উভয়ের সংঘাত হল। যখন তারা একে অপরের মিলনের জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিল, তখনই শ্যামের জীবনে আরেকটি মেয়ের অনুপ্রবেশ ঘটল।

সে মেয়েটির নাম ছিল মোমতাজ। তাজি বলেই পরিচিত ছিল। এ হলো জেব কুরাইশী এম-এ-র ছোট বোন। শ্যামের এই ডিগবাজি কুলদীপের ভালো লাগলো না। সুতরাং সে শ্যামের ওপর খপ্পা হয়ে গেল। চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ হলো। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, কুলদীপ ছিল দারুন জেদি মেয়েমানুষ। যে কথা একবার তার মাথায় আসতো তা সে কখনও ছাড়তো না। আমি একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করি। এটা বোম্বের কথা। আমরা তিনজনই বোম্বে টকিজে কাজ করতাম। সন্ধ্যায় ইলেকট্রিক ট্রেনে বাড়ী ফিরতাম। ফাস্ট ক্লাস কামরা সে সময় প্রায় খালিই থাকতো। আমরা তিনজন ছাড়া আর কোন যাত্রী উঠতোনা এই কামরায়।

শ্যাম দারুণ মুখরা আর বেপরোয়া লোক ছিল। কামরায় কেউ নেই দেখে সে কুলদীপের সাথে মস্করা শুরু করল। আমি মনে করলাম, তাদের দুজনের যে সম্পর্কটা লাহোরে জমে উঠেছিল, এবার তা আবার স্থাপিত হবে। কেননা তাজির সাথে তার অবনিবনা হয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, রমলা কলকাতায় আর নিগার সুলতানা তখন গীতিকার মাধোকের কাছে। শ্যামের ভাষায় তখন সে একেবারে "রিক্ত-হস্ত" ছিল।

সুতরাং সে কুলদীপকে বলল ঃ কে, কে, তুমি আমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকছ কেন? আমার কলিজার টুকরা, একটু পাশে এসে বসো না।

কুলদীপের নাক আরও শানিত হয়ে উঠল। সে বলল ঃ 'শ্যাম সাহেব, আপনি আর আমার ব্যাপারে নাক গলাবেন না।' তাদের কথাবার্তা-যা আমার মনে আছে, তা অবিকল বলতে চাইনে।

কোনো, সেগুলো খুবই অশোভন এবং নোংরা ছিল। এমনি তার সাধারণ নিজের কথায় বলি। শ্যাম কখনও সিরিয়াসলী কথা বলত না। প্রত্যেক কথায়ই হা হা করে হাসতো। সে কুলদীপকে তার নিজস্ব ভঙ্গিতে বলল ঃ প্রিয়ে কুলদীপ, ওই গর্দভ প্রান-টাকে ছেড়ে দিয়ে তুমি আমার সাথে চলে এসো। সে তো আমারও বন্ধু, ব্যাপারটার খুব সহজেই মীমাংসা করে নেয়া যাবে।

কুলদীপ কাউরের চোখও তার নাকের মতই বড় তীক্ষ্ণ ছিল। তার দেহের প্রতিটি বাঁকই এমন তীক্ষ্ণ ও ধারালো যে, সে যখন চোখ স্থির করে কারো সাথে কথা বলে তখন লোকরা ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায়।

সে তীব্র দৃষ্টিতে শ্যামের দিকে তাকালো এবং তার চেয়েও তীব্র স্বরে বলল ঃ শ্যাম সাহেব, মুখ ধুয়ে আসুন। শ্যাম জোরে হেসে বলল ঃ আমার জানের জান, লাহোরে থাকতে তুমি না আমাকে পেতে চাইতে সে কথা কি মনে নেই ?

এবার কুলদীপের হাসবার পালা। সে হাসি নারীসুলভ বিদ্রুপে ভরা ঃ শ্যাম আপনি ভুল বুঝছেন। শ্যাম বলল ঃ তুমি ভুল বলছ, তুমি যে আমার জন্যে পাগল ছিলে তার এক রত্তিও মিথ্যা না। আমি কুলদীপের দিকে চাইলাম। তার অভিব্যক্তিতে পরাজয়ের ভাব। কিন্তু তার হঠকারী মন তার এ ভাবকে বাঁধাদিতে চেষ্টা করছে। সে তার চোখের পল্লব নাচিয়ে বলল ঃ তখন যদিও মরতাম, কিন্তু এখন আর মরছি না জেনো।

শ্যাম তার নির্বোধ সুলভ সরলতার সাথে বলল ঃ আজ না মরলেও কাল মরবে আবার। আমার জন্যে তোমাকে মরতেই হবে। কুলদীপ কাউর বিরক্ত হল ঃ শ্যাম, তুমি শেষবারের মত শুনে রাখ। সেদিনের কথা তুমি ভুলে যাও। তুমি মনে মনে কৌতুক অনুভব করছ। হতে পারে লাহোরে তোমার প্রতি একটু ঝুঁকে পড়েছিলাম। কিন্তু তুমি তার মর্য্যাদা দিলেনা। এখন এ সব বকবাজী থামাও।

এসব তর্ক শেষ হলো। তবে সাময়িক ভাবে। কেননা শ্যাম বেশি তর্কাতর্কি করার লোক ছিল না।

কুলদীপ কাউর আটারির (এখন পাকিস্তানে) এক ধনবান অভিজাত শিখ পরিবারের মেয়ে। সে পরিবারের এক লোকের সাথে লাহোরের এক বিখ্যাত মুসলিম মহিলার সম্পর্ক ছিল। সেই মহিলাকে লোকটি প্রচুর অর্থ দিয়েছিল। এবং এখনও (বিভাগোত্তরকালে) দিয়ে থাকে।

যখন দেশভাগ হলো কুলদীপ কাউর ও প্রাণ গোলমালের মধ্যে লাহোর ছেড়ে এল। কিন্তু প্রাণের মোটর (সম্ভবত কুলদীপের সম্পত্তি) লাহোরে পড়ে থাকে। কিন্তু কুলদীপ কাউর ছিল দারুণ সাহসী মেয়ে। কিছুদিনের জন্য সে লাহোরে এলো এবং দাঙ্গার সময়ে মোটরটা নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে বোম্বে পৌঁছল।

আমি মোটর দেখে প্রাণকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কবে কিনেছ? তখন প্রাণ বলল যে, এটা কে, কে, লাহোর থেকে নিয়ে এসেছে। এতটা পথ আসতে তার কোন অসুবিধা হয়নি। শুধু দিল্লীতে একটা গোলমালের জন্য কয়েকদিন থামতে হয়েছিল শুধু।

গাড়ী আনার পর সে শিখদের ওপর মুসলমানদের অত্যাচারের কথা বলল। বলতে বলতে সে এত উত্তেজিত হয়ে উঠল যে, মনে হল টেবিল থেকে মাখন লাগানোর ছুরি তুলে বেমালুম আমার পেটে বসিয়ে দেবে। কিন্তু পরে জানতে পারলাম আসলে সে একটু ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছিল। নয়তো মুসলমানদের ওপর তার কোন বিরুদ্ধ মনোভাব ছিলনা। আসলে তার কোন ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিলনা।

তার নাক যেমন তীক্ষ্ণ চোখও তেমন আর ঠোঁট দুটো খুব পাতলা। এ কারণে রাগলেই তার চোখ মুখের ভীষণ পরিবর্তন দেখা দেয়। তাছাড়া তার কথা বলার ভঙ্গি, কণ্ঠস্বরও দারুণ আকর্ষনীয় ছিল। এবার এ সম্পর্কে একটা মজার কাহিনী বলি।

আমি ফিল্মিস্তান ছেড়ে আমার বন্ধু আশোক কুমারও সাভাক ওয়াচার সঙ্গে বোম্বে টকিজে এলাম। সে সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল। সে সময় কুলদীপ কাউর ও তার রক্ষিত (ভেড়ুয়া) চাকরির জন্য সেখানে আসে।

শ্যামের মাধ্যমে প্রাণের সাথে আমার আলাপ হলো। প্রথম পরিচয়েই তার সাথে বন্ধুত্বও হয়ে গেল। খুব অকপট লোক।

কুলদীপ কাউরের সাথে অবশ্য লৌকিকতার পর্যায়েই আলাপ হলো।

আমাদের স্টুডিওয় তখন তিনটি ছবি শুরু হওয়ার কথা। তাই কুলদীপ যখন মিঃ সাভাক ওয়াচার সাথে দেখা করল জার্মান ক্যামেরাম্যান মিঃ জোসেফ ওয়াশিংকে কুলদীপের ক্যামেরা টেস্ট নেওয়ার জন্যে বলল।

ওয়াশিং গৌরবর্ণ প্রৌঢ় বয়সের মোটাসোটা লোক। হিমাংশু রায় তাকে জার্মানী থেকে সঙ্গে এনেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাকে দেওলালিতে আটক রাখা হয়। যুদ্ধ শেষে তাকে মুক্তি দেয়া হলে সে আবার বোম্বে টকিজে ফিরে আসে। মিঃ ওয়াচা ও ওয়াশিং-এর বন্ধুত্ব ছিল দীর্ঘদিনের। ওরা দুজনই বোম্বে টকিজে এক সঙ্গে কাজ করত। মিঃ ওয়াচা তখন সাউন্ডরেকর্ডিস্ট ছিল।

মিঃ ওয়াশিং স্টুডিয়োতে আলোর ব্যবস্থা করে মেক-আপ ম্যানকে বলল কুলদীপকে তৈরি করে আনতে। ওয়াশিং নতুন ক্যামেরা নিয়ে তৈরি হয়ে এল। ক্যামেরা ঠিক করে সে দূরে দাঁড়িয়ে চুরুট ফুঁকছিল।

একটু পরই কুলদীপ কাউর এল। মেক-আপম্যান তার নাকটাকে সাদা রঙে এমন ভাবে রাঙিয়ে তুলেছিল যে, নাকটা আগের চেয়ে খাড়া আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। ওয়াশিং তাতে চমকে উঠল। এ যে শুধু নাকই নাক।

কুলদীপ কাউর নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়াল। ওয়াশিং এবার ক্যামেরার মাধ্যমে তাকে দেখল। আমার মনে হল, সে খুবই বিপন্ন বোধ করছিল। সে তার নাকটাকে কোন এঙ্গেল থেকে টেক করবে সেই চেষ্টা করছিল।

বেচারা একেবারে ঘেমে উঠল। অবশেষে শ্রান্ত হয়ে আমাকে বলল ঃ আমি এক কাপ চা খাব। আমি ব্যাপারটা বুঝলাম। তাই তাকে সঙ্গে নিয়ে ক্যান্টিনে গেলাম। ওয়াশিং ঘাম মুছে বলল ঃ মিঃ মান্টো—ওর নাকটা একটা আপদ—ক্যামেরার মধ্যে আগেই চলে আসে। চেহারা আসে পরে। কি যে করি, বুঝতে পারছি না।

আমিও কিছু বুঝলাম না। তাই বললাম ঃ তোমার ব্যাপার তুমি জান।

তারপর সে আরও একটা জটিল কথা বলল। কানে কানে বলল ঃ মিঃ মান্টো, ওর স্তন দুটোও ঠিক নয়। কিন্তু আমি কি করে যে ওকে বলি। বলে মোটা ওয়াশিং আবার কপালের ঘাম মুছল।

আমি বুঝে নিলাম। তবু ওয়াশিং আমাকে সবকথা খুলে বলল এবং আমাকে জানালো যে, আমি যেন কে, কে-র কাছে বলি —সে যেন ওটা ঠিক করে আসে এটা খুব দরকার। তার নাকটা যে কোন এঙ্গেল থেকে ঠিক করে নেয়া যাবে। কিন্তু ওটা তো ওর গোপন ব্যাপার। আমি তাকে সান্তনা দিলাম, সব ঠিক করে দেব। সে ওটা ঠিক করবার পন্থা বলে দিল। ওটা পয়ত্রিশ টাকায় হোয়াইটওয়ে এণ্ড লেডল'র দোকান থেকে পাওয়া যাবে।

সেদিন অন্য একটা বাহানা করে ক্যামেরা টেস্ট স্থগিত রাখা হল। কুলদীপ স্টুডিও থেকে বাইরে এলে আমি তাকে সে বিষয়টা বললাম। আরও বললাম যে, সে যেন আজই কোর্ট এলাকায় গিয়ে ওটা কিনে আনে। যাতে করে তার দৈহিক বৈষম্য দূর হবে। সে আমাকে নিঃসংকোচে জানালো যে, এ আর এমন বড় কথা কিসের। অতএব সে তখনই প্রাণের সঙ্গে গিয়ে সেই জিনিসটা কিনে আনল। পরদিন স্টুডিওতে তার সাথে দেখা হতেই মনে হল আজ সম্পূর্ণ অন্য রকম সে। এ সব জিনিসের আবিষ্কর্তাদের ধন্যবাদ দিতে হয়। কেমন বস্তুকে কিসে রূপান্তর করে দেয়।

ওয়াশিং তাকে দেখে নিশ্চিন্ত হল। যদিও কুলদীপের নাক তাকে বিরক্ত করছিল, তবু তার মুখ্য অঙ্গের ত্রুটি দূর হয়েছিল। সুতরাং সে তার টেস্ট নিল। প্রিন্ট তৈরির পর আমরা প্রোজেক-শন হলে তার ছবি দেখলাম। সকলেই পছন্দ করল এবং সেখানেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে, বিশেষ বিশেষ চরিত্রের জন্য সে খুবই ভাল হবে। বিশেষ করে ভ্যাম্পরোলে। কুলদীপের সাথে আমার খুব বেশি দেখা সাক্ষাৎ ঘটেনি। যেহেতু প্রাণ আমার বন্ধু ছিল। প্রায় সন্ধ্যাই তার সাথে কাটাতাম। কুলদীপও মাঝে মাঝে তাতে যোগ দিত। সে থাকতো সমুদ্রের ধারে একটা হোটেলে। আর প্রাণ তার প্রায় কাছেই একটা কোয়ার্টারে থাকতো। তার স্ত্রী-পরিজনও সেখানে ছিল। কিন্তু তার অধিকাংশ সময়ই

কুলদীপের কাছে অতিবাহিত হতো। আমি আপনাদের আরেকটা মজার কথা বলি।

একদিন আমি আর শ্যাম তাজ হোটেলে বিয়ার খেতে যাচ্ছিলাম। পথে বিখ্যাত গীতিকার মাধোকের সাথে দেখা হল। সে আমাদের এ্যারোজ সিনেমার বারে নিয়ে গেল। মাধোক ছিল ট্যাকসীর রাজা। দরজার বাইরে বিরাট ট্যাকসী দাঁড়ানো। এটা গত তিন দিন ধরে তার কাছে আছে।

খাওয়া শেষ হলে মাধোক জিজ্ঞেস করল আমরা কোথায় যেতে চাই। মাধোক তার প্রেমিকা নিগার সুলতানার কাছে যাবে। কোন এক সময়ে এর সাথে শ্যামেরও সম্পর্ক ছিল। কুলদীপ কাউরও তার আশে পাশেই থাকতো। শ্যাম আমাকে বলল ঃ চল, প্রানের সঙ্গে দেখা করে আসি।

সুতরাং আমরা মাধোকের ট্যাকসীতে বসেই সেখানে গেলাম। আর মাধোক চলে গেলো নিগার সুলতানার কাছে। আমরা কুলদীপের ঘরে গিয়ে দেখলাম, সেখানে প্রাণ বসে আছে। ছোট্ট একটা মাত্র কামরা। শ্যাম প্রস্তাব করল যে, তাস খেলা যাক। কুলদীপ তখনই রাজি হল, কিন্তু বলল ফ্লাশ খেলতে হবে।

ফ্লাস শুরু হল। প্রাণ তাস ভাগ করল—আর কুলদীপও প্রাণ পার্টনার হল। চাল দিচ্ছিল প্রাণই। কুলদীপ শুধু প্রাণের কাঁধের ওপর থুতনী রেখে বসে রইল। তবে প্রান যত টাকা জিতল, সে সব টাকা তুলে নিজের কাছে রাখতে লাগল।

সে খেলায় আমরা হারলাম। আমি অনেক ফ্লাস খেলেছি। কিন্তু এই ফ্লাস আমার কাছে আজব ধরণের মনে হল। কেমন করে যেন আমার পাঁচাত্তর টাকা পনের মিনিটেই কুলদীপ কাউরের হাতে চলে গেল। আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার কি হল আজ। কোনবারই ঠিক মত তাস আমার পক্ষে আসে না।

শ্যাম এই পরিস্থিতি দেখে বলল ঃ মান্টো বন্ধ কর তো।

আমি খেলা বন্ধ করলাম। প্রাণ হেসে কুলদীপকে বলল ঃ কে, কে, মান্টো সাহেবের পয়সা গুলো ফিরিয়ে দাও।

আমি বললাম। এটা ঠিক নয়। তোমরা জিতেছ, ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। প্রাণ বলল, কে, কে, একজন প্রথম

শ্রেণীর হাত সাফাইকারী—সে যা জিতেছে, তা এই চালবাজীর গুণেই। সে তাসের প্যাকেট হাতে নিয়ে কয়েকবার তাস বাঁটল—তখন প্রতিবারই দেখা গেল যে, জিতের তাস তার ভাগে পড়েছে। তখন আমি তার হাত সাফাই বিশ্বাস করলাম। কাজটা বড়ই শক্ত। প্রাণ কুলদীপকে টাকা ফেরত দেয়ার কথা বলল। কিন্তু কুলদীপ টাকা ফেরত দিতে রাজি হলো না। এতে শ্যাম খুব রেগে গেল আর প্রাণ অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। সম্ভবতঃ তার স্ত্রীকে নিয়ে কোথায়ও যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। আমি আর শ্যাম সেখানে বসে ছিলাম। শ্যাম তার সাথে কিছুক্ষন আলাপ করল। তার পর বলল ঃ চল, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি। কুলদীপ তাতে রাজি হল।

তখনই ট্যাকসি আনিয়ে আমরা বাইকুল্লা রওয়ানা হলাম। ক্লেয়ার রোডের ওপর আমার বাসা। তখন এ বাসায় কেউ ছিল না। আমিও শ্যাম এখানে থাকতাম। ফ্লাটে ঢুকতেই শ্যাম কুলদীপকে উত্যক্ত করতে লাগল। কুলদীপ সহজে রাগবার পাত্রী ছিল না। সে কোন পুরুষকেই ভয় পেত না। তার দারুণ আত্মবিশ্বাস ছিল। তাই বহুক্ষন যাবৎ সে শ্যামের সাথে কৌতুক করে চলল।

হাঁ, আমি একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। ক্লেয়ার রোডে ট্যাকসী আসতেই কুলদীপ একটা স্টোরের সামনে গাড়ি থামিয়ে বলল যে, সে একটা সেন্ট কিনবে। শ্যাম জ্বলে উঠল। ফাঁকি দিয়ে টাকা জিতে তা দিয়ে সেন্ট কিনবে। আমি তাকে সান্তনা দিলাম যে, এ নিয়ে আর কোন কথা বলো না। শ্যাম ট্যাকসীতে বসে রইল আর আমি কুলদীপের সাথে স্টোরে গেলাম। সে একটা সেন্ট পছন্দ করল, যার দাম ছিল বাইশ টাকা আট আনা। কুলদীপ সেন্টের শিশিটা ব্যাগে পুরে আমাকে বলল ঃ মাল্টো সাহেব, দামটা দিয়ে দিন।

আমি ওটার দাম দিতে চাইনি। কিন্তু দোকানদার আমার পরিচিত—আর একটা মেয়ে যখন এভাবে বলল তখন না দিয়ে উপায় কি। অন্ততঃ পুরুষালী সম্মান যাতে নষ্ট না হয় সে খেয়ালও রাখতে হবে। তাই পকেট থেকে টাকা বের করে দিলাম। ফ্লাটে গিয়ে শ্যাম যখন জানতে পারল যে, সেন্ট

আমি কিনে দিয়েছি তখন সে আরও রেগে গেল। সে আমাকে ও কুলদীপকে কষে গালি দিল। অবশ্য পরে একটু শান্ত হল। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল কুলদীপ যে কোন ভাবে তার বশ হোক। আমিও কুলদীপ কাউরকে বললাম ঃ আগে যা হবার হয়েছে—এবারে তোমরা এসব মিটিয়ে ফেল। কুলদীপ যেন রাজি হল। আমি তখন বললাম ঃ আমি যাচ্ছি। তোমরা এখানে বসে একটা সমঝোতা করে নাও। কিন্তু কুলদীপ বলল ঃ না, এখানে না। আমার হোটেলে গিয়েই এর সমঝোতা হবে। নিচে ট্যাকসী দাঁড়িয়ে ছিল। দু'জন ট্যাকসীতে গিয়ে বসল। আমি খুশী হলাম, যাক, ওদের বিবাদ মিটে গেল।

কিন্তু পৌনে একঘন্টা পরই শ্যাম ফিরে এল। রাগে থরথর করে কাঁপছে। হাতটা জখম হয়েছে আর রক্ত ঝরছে। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু সে রাগে কাঁপছিল। ব্রাণ্ডি পানের পর তার মেজাজ একটু ঠান্ডা হল। তখন সে বলল ঃ হোটেলের সামনে গাড়ি থেকে নামতেই কুলদীপ অনমনীয় ভাব দেখাল। আমি বললাম ঃ লাহোরে তো আমার জন্যে পাগল ছিলে, এখন এত ঢং করছ কেন? সে তখন আমাকে এমন একটা কথা বলল যে, মাথায় রক্ত চড়ে গেল আমার আমরা একটা দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। রেগে কুলদীপকে জোরে একটা ঘুষি মারলাম। কুলদীপ মাথা সরিয়ে নিল। ঘুষিটা দেয়ালে লেগে হাতটা জখম হয়ে গেল। সে হাসতে হাসতে তার হোটেলে চলে গেল আর আমি দাঁড়িয়ে আহত হাত দেখতে লাগলাম।

কুলদীপ কাউর বিচিত্র স্বভাবের মেয়ে। তার নাক যেমন তীক্ষ্ণ—তেমনি তার চরিত্রও।

কিছুদিন আগে খবরে পড়লাম যে, সে ভারতে পাকিস্তানী গুপ্তচর বৃত্তি করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জানি না, একথা কতটুকু সত্যি।

আনোয়ার কামাল পাশাঃ বাপকাগুনাহ

যদি কোন স্টুডিওতে আপনি কোন পুরুষের উচ্চকণ্ঠ শুনতে পান, যদি কেউ আপনার সঙ্গে বারবার জিব বের করে ঠোঁট চেটে চেটে কথা বলে অথবা কোন অনুষ্ঠানে কাউকে বক্তৃতা করার সময় যদি মনে হয় যে, সে সান্ডার তেল বিক্রি করছে, তখন আপনি বুঝতে পারবেন, সে হাকীম আহমদ শুজা পাশার সুযোগ্য পুত্র মিস্টার আনোয়ার কামাল পাশা।

চিত্র পরিচালক আনোয়ার কামাল পাশার নাম যখন আমি কোন পত্রিকায় দেখি তখন হঠাৎ তুরস্কের সমর-নায়ক আনোয়ার পাশার কথা আমার মনে পড়ে। ছোটবেলায় আমরা পাঞ্জাবী ভাষায় গান করতাম ঃ

মুস্তফা পাশা কামাল দে তেরিয়াঁ দূর বালাইয়াঁ
কর বক্‌রে ইউনানী হালাল দে বেবাওয়াঙ্গ কসাইয়াঁ
নাল তেরে হোবে আনোয়ার দি ঘোড়ী।

মুস্তফা কামাল পাশা ও আনোয়ার পাশা উভয়ে মিলে গ্রীক মেষ দের হত্যা করেছে। পরে তাদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয় এবং তাঁরা পৃথক হয়ে যায়।

আমার মনে হয়, আনোয়ার কামাল পাশা এই উভয় নেতার ব্যক্তিত্বের প্রতিভার সমন্বয় সাধনের জন্য এ নাম গ্রহণ করেছে। সম্ভবতঃ অন্য কারণও থাকতে পারে।

তবে যদি আপনি আনোয়ার কামাল পাশাকে দেখেন তাহলে তার মধ্যে মুস্তফা কামালের নেকড়েপনা (ঐতিহাসিকগণ কামাল আতাতুর্ককে গ্রে উল্‌ফ্ বলেন) পাবেন না, আনোয়ার পাশা স্বাস্থ্যোজ্জল ও সুদর্শন।...সে আমার মনে হয় ভেড়িয়া (নেকড়ে)

হওয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ভেড় (মেষ) হয়েছে, আর সুন্দর হওয়ার চেষ্টা করে অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে আপন দেহ সৌষ্টব নিয়েই তৃপ্ত আছে।

সে যাই হোক। অনুমাননির্ভর কোন কিছুতেই ফল লাভ হয় না। আনোয়ার কামাল পাশার ব্যক্তিত্ব একক। আনোয়ার পাশার চোখের নেকড়ে দৃষ্টি না থাকলেও তার কিছুটা চমক আছে তার চোখে। এতে প্রকাশ পায়, সে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রাখে।

দৈহিক শক্তি তার এতটাই আছে, যতটা এই অধমের নড়বড়ে দেহে বিদ্যমান। কিন্তু সে আমার মতই দম্ভ করে বাকী টুকু পুরা করে নেয়।

আসলে সিনেমা লাইনে জোরেশোরে গলাবাজি করে দাবী জানানোই যোগ্যতার প্রমাণ বহন করে। একটা প্রবাদ আছে, 'পেদরম সুলতাঁ বুদ' (আমার বাবা বাদশাহ ছিলেন)। কিন্তু আনোয়ার কামাল পাশার মুখে সব সময় ঠিক এর বিপরীতটাই শোনা যেতো যে, আমার বাবা রাজা ছিলেন না—রাখাল ছিলেন। রাজা তো আমি নিজে। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এই নেতিবাচক উক্তি প্রভাব বিস্তারের কারন বহন করে। আমার মনে হয়, আনোয়ার কামাল পাশা মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করেছে। তাই সে বিনা দ্বিধায় এই কৌশল চালিয়ে আসছে। কোথায়ও এজন্য সে হোচটও খেয়েছে—তা সত্ত্বেও সে তার কাজ ঠিকই হাসিল করে নিয়েছে।

সে তার পিতার অভাজন পুত্র নয়। কিন্তু পার্থিব কর্মকাণ্ডের জন্যে সে যখন অপরের ওপর প্রভাব বিস্তারে আবশ্যক মনে করে—নিজের পিতা সম্বন্ধে একথা বলতে পিছপা হয় না যে, সে তো একটা গোমূর্খ। আর এতে তার পিতারও কোন আপত্তি ছিল না। এজন্য যে, হাজার রকমের পাচন ও সালসা তৈরীর পর তিনি এতটা জানতেন, আমার সুযোগ্য সন্তান আমাকে গোমূর্খ বানিয়ে এমন একটা সিঁড়ি বানাচ্ছে যার সাহায্যে সে উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করবে।

এখনও তার সে সিঁড়ির সমস্ত ধাপ তৈরি সম্পূর্ণ হয়নি, কিন্তু আশা করা যায় শীগগীর হয়ে যাবে। খুব সম্ভবত আনোয়ার কামাল পাশা অচিরেই কোন মই লাগিয়ে খোদার আরশ পর্য্যন্ত

পৌছে যাবে। আর এই অসম্পূর্ণ সিঁড়িটাকে সে হতাশার মধ্যে ফেলে রেখে যাবে।

কিন্তু আমার বিস্ময় লাগে, আসলে সে তত চতুর নয়, ধূর্ত নয়, প্রতারক নয়। এতদসত্ত্বেও যখন লোকে তার মুখের কথার তুবড়ি ছুটতে দেখে তখন কিছুক্ষণের জন্য তার মোহে প্রভাবিত হয় বৈ কি।

হয়তো তারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য পরে আফসোস করে যে, এ তো শুধু দৃষ্টি বিভ্রম ছিল। কিন্তু তাতে কি এসে যায়। আনোয়ার কামাল পাশা এই অবসরে অপর একটা ভেল্কি আবিষ্কার করে ফেললো। তখন সে তার দ্বিতীয় ছবি বানানোর জন্যে পুঁজি বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে আমি এমন একটা ছবি তৈরি করব হলিউডেও তেমন ছবি কোনদিন হয়নি। তাতে কোন অভিনেতা অভিনেত্রী থাকবে না—শুধু কাঠের পুতুল—তারাই গাইবে, কথা বলবে, নাচবে—আর ক্লাইমেক্সে গিয়ে সব রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে যাবে।

আনোয়ার কামাল পাশা শিক্ষিত লোক। এম এ পাশ। ইংরেজী সাহিত্যে তার প্রচুর জানা শোনা। এটাই একমাত্র কারণ যে, সে তার ছবির কাহিনী সেখান থেকেই নেয়, এবং প্রয়োজন বোধে সেটাকে খাসা উর্দুতে রূপান্তর করে নেয়। তার ছবির সব চরিত্র নাটকীয় ভঙ্গিতে কথা বলতে অভ্যস্ত। তার কারণ এই যে, তার পিতা হাকীম আহমদ সুজা পাশা সাহেব আগে ভাল নাটক লিখতেন। তাঁর লেখা নাটক 'বাপকা গুনাহ' খুব প্রশংসা পেয়েছিলো।

একটা মজার কথা শুনুন। আনোয়ার কামাল পাশা সম্বন্ধে এক মজলিসে আলাপ হচ্ছিল। সে সময় এক ভদ্রলোক—আমি তাঁর নাম বলতে চাইনে, বললেন ঃ জী, আমি আনোয়ার সাহেবকে জানি, সে তো 'বাপকা গুনাহ্'।

সে যাই হোক, আনোয়ার কামাল পাশা চমকপ্রদ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এত কথা বলে যে, তার মতো কেউ বলতে পারে না। আসলে আমার মনে হয় সে তার নিজের কথা শুনতে ভাল বাসে এবং মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করে বলে, হে আনোয়ার

কামাল, তুমি আজ কামাল করেছ। তোমার মত এমন বক্তা আর কেউ নেই।

যদি আপনি মনস্তত্ব সম্বন্ধে কিছু জানেন, তাহলে আপনি জানতে পারবেন যে, অনেক লোকেরই এই রোগ থাকে। তারা নিজেরাই রেকর্ড হয়ে যেতে চায়। আর সব সময় নিজেকে গ্রামোফোনের সুঁইয়ের নিচে রেখে নিজেই শুনতে চায়। আনোয়ার কামাল পাশাও সেই দলের একজন।

নিজ সংলাপের কয়েকটা রেকর্ড আছে তার। নিজেই তা বাজায় আর শোনে, আর যখনই শেষ হয়ে যায় তখন নিজের অনুরোধ করা গান শোনা বাচ্চাদের মত খুশী হয়ে সভা ছেড়ে চলে যায়।

তার মনে অস্থিরতার ভাগ অত্যন্ত বেশি। জানিনা, কেন? এটা কোন মনস্তত্ত্ববিদই বলতে পারেন ভালো। তার সব ছবিতেই নদী থাকতে হবে। তাতে অবশ্যই কেউ ডুববে। সে যতগুলো ছবি তৈরি করেছে, তার কিছু সফল হয়েছে কিছু ব্যর্থ হয়েছে। যেমন ঃ দো আঁসু, দিলবর, গোলাম, ঘিবরু, এবং গুমনাম।

আপনি যদি এসব ছবি দেখে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন প্রায় ছবিতেই নদী আছে। আর তাতে তার গল্পের নায়ক বা অন্য কেউ ডুবেছে। অথচ মৃত্যুর ওপর তার কোন আস্থা নেই। সে যাদের নদীতে ডুবিয়ে থাকে, পরে বলে যে, ডোবেনি, অর্থাৎ মরেনি। কোন না কোন (আনোয়ার কামাল পাশার বিস্ময়কর উদ্ভাবনী বলতে হবে) কায়দায় তারা বেঁচে থাকে।

জানিনা আমার কথা কতটা সঠিক। কিন্তু আমি মনে করি, আনোয়ার কামাল পাশার জীবনও ডুবে ডুবে বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত।

সে তার জীবনে কয়েকটি নদী সাঁতরেছে। একটা হল তার সামাজিক ভাবে বিবাহিতা স্ত্রী। তা পার হতে তার কোন অসুবিধে হয়নি। কিন্তু যখনই তার সামনে বোম্বে থেকে লাহোর পর্যন্ত প্রবহমান শামীম নামের নদী এসে পড়ল, তখনই সে একটু বিপন্ন বোধ করল। কিন্তু তবু সে একজন দক্ষ সাঁতারুর মত তাও পেরিয়ে গেল।

ছবির শখ তার বহুদিনের। এই শখই তার নেশায় পরিণত হল। শামীমের সাথে যখন তার আলাপ পরিচয় হল তখন সে তাকে দিয়ে সুযোগ করে নিল। লাউড স্পীকার হয়ে চারিদিক গুঞ্জন শুরু করল। এসো, আমরা চমৎকার ছবি তৈরি করি। এমন কোন দাতা আছে যে আমাকে মূলধন দেবে ?

এভাবে ক্রমাগত প্রচারণার ফলে সে একদিন মূল-ধন পেয়েও যেতো। শামীম বোম্বেতে এমন একটা নদী ছিল—যার পানি ছিল খুবই স্বচ্ছ। সে পানিতে কয়েকজন ডুবুরি সাঁতারও কেটেছে। কিন্তু কিছুদিন পর সে পানি বরফের মতে জমে গেল। তখন আর সাঁতারুদের কোন আকর্ষনই রইল না। সে জন্যই তাকে নিজ জন্মভূমি লাহোরে ফিরে আসতে হল।

এসব কাহিনী থাক। এটা তো কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নয়। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে, কোন ফিল্ম ডাইরেকটর মেয়েদের অবলম্বন করেই অগ্রসর হয় এবং তার মাধ্যমেই পিছিয়ে পড়ে। আর এমন বিশ্রী ভাবে পিছিয়ে যায় যে, তাদের নাম চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট আর থাকে না।

পাশা কিছুদিন পর শামীমকে বিয়ে করল এবং তার মনতুষ্টির জন্য তার সব কিছু শামীমের হাতে সমর্পণ করে দিল।

আমি এ প্রবন্ধ আর দীর্ঘ করতে চাই না। কেননা, আমি আনোয়ার কামাল পাশার মত দীর্ঘসূত্রী হতে চাইনে। সে যেমন চমকপ্রদ ব্যক্তিত্বের অধিকারী তেমনি সেই ব্যক্তিত্বের কয়েকটি দিক আছে। সে একদিকে যেমন হঠকারী তেমনি নরম মেজাজেরও বটে। যেমন বক বক্ করতে পারে, তেমনি শান্তও থাকতে পারে।

তার চরিত্রে আমি যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি, তা হল সে মোগলাই জাঁকজমক পছন্দ করে। তার পছন্দ হলে সে আপনার সব কিছুই পসন্দ করবে। আর যদি 'মুডে' না থাকে আপনার সাথে কথাও বলবে না।

আমি প্রবন্ধ শেষ করতে গিয়ে একটা ঘটনা শোনাই। কিছুদিন আগে আমি শাহনূর স্টুডিওতে ছিলাম। আনোয়ার কামাল পাশা সেখানে তার 'গুমনাম' ছবির শুটিং করছিল।

শীতকাল। আমি আমার কামরার বাইরে একটা চেয়ারে বসে টাইপ রাইটার সামনে নিয়ে চিন্তা করছিলাম। এমন সময় পাশা গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমার পাশের চেয়ার এসে বসল। অভিবাদন বিনিময় হল। একটু পরই সে বলল ঃ মান্টো সাহেব, আমি একটা দারুণ ভাবনায় পড়েছি।

আমি সচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম ঃ কিসের দুর্ভাবনা আপনার ?

সে বলল ঃ আমি যে ছবি করছি, তার এক জায়গায় গিয়ে আটকে পড়েছি। আপনার কাছে আমি পরামর্শ চাই। সম্ভবতঃ আপনি সংকট দূর করতে পারবেন।

আমি বললাম ঃ আমি প্রস্তুত আছি। বলুন আপনি কোথায় আটকা পড়েছেন ?

সে আমাকে ছবির কাহিনী শুনাতে লাগল। দু'টি দৃশ্য এমন ভাবে শুনালো, যেন ট্রাফিক পুলিশ লাউডস্পীকার দ্বারা পথচারীদের নির্দেশ দিচ্ছে যে, তাদের বামদিকে যেতে হবে। আমি তো সারা জীবনই বামদিকেই চলেছি—তাই পাশাকে বললাম ঃ আপনার সবটা শুনাবার দরকার নেই। আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কোন গর্তে পড়েছেন।

পাশা বিব্রত হয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল ঃ আপনি কি করে বুঝলেন।

আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম। এবং তার সমাধানও বলে দিলাম। আমার কথা শুনে সে উঠে পায়চারি করতে লাগল। তারপর বলল ঃ হাঁ, আপনার সমাধান ঠিকই মনে হচ্ছে।

আমি একটু বিরক্তির সাথে বললাম, এর চেয়ে ভাল সমাধান আপনাকে আর কেউ দিতে পারবেনা। তবে বিপত্তি হল যে, আমি খুব ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত দিতে অভ্যস্ত। যদি আমি এই পরামর্শ দশ বার দিন চিন্তা ভাবনা করে দিতাম, তাহলে বলতেন, বাহ্, সুবহানাল্লাহ। আর যখন আমি কয়েক মিনিটেই আপনাকে সমাধান বলে দিলাম তখন কিনা আপনি বললেন, হাঁ ঠিকই মনে হচ্ছে। বোধহয় আপনি এ পরামর্শের দাম জানেন না।

পাশা তখনই প্রোডাকশন ম্যানেজারকে ডেকে আনল। তার কাছ থেকে চেক বুক নিয়ে লিখে অত্যন্ত সহজভাব বলল ঃ এটা আপনি গ্রহণ করুন। তার অনুরোধে আমি সেটা নিলাম। পাঁচ শো টাকার চেক। এটা আমার খুব বাড়াবাড়ি মনে হল। যদি আমার অবস্থা স্বচ্ছল থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই আমি এ চেক ছিঁড়ে ফেলতাম। কিন্তু নিগৃহীত মানুষদের জীবনের অবস্থা কত দুঃখজনক যে, সে পতিত হতে বাধ্য হয়।

আমি এবার লেখা শেষ করছি। আনোয়ার কামাল তার বিবাহিতা স্ত্রীর ঘরে সন্তান জন্মায় আর তার রক্ষণাবেক্ষণ করে শামীম। সে একটা রেলগাড়ি—তার মধ্যে অনেক যাত্রীর ঠাঁই আর আনোয়ার কামাল হচ্ছে ইঞ্জিন-ডাইভার। সে তার পেটে ইন্ধন যোগায়। কিন্তু আমার মনে হয়, সে রেলের ইঞ্জিনের এমন একটা ভেঁপু যা রাতের নীরব পরিবেশে ফেড আউট হয়ে যাচ্ছে।

নৃত্যপটিয়সী সেতারা—

লেখার ব্যাপারে আমি অনেক কঠিন পরিক্ষা-নিরীক্ষার পর্য্যায় অতিক্রম করে এসেছি, কিন্তু খ্যাতনাম্নী নর্তকী সিতারা সম্পর্কে আমার ধারনাকে রূপদান করতে গিয়ে বড়ই হিমশিম খাচ্ছি। আপনারা তো তাকে একজন অভিনেত্রী হিসেবেই চেনেন—যে খুব ভালো নাচতে জানে—কিন্তু আমি তার যে অভিনব চরিত্র পাঠ করার সুযোগ পেয়েছিলাম—তা যেমন অভাবিত তেমনি বিস্ময়কর।

জীবনে আমি অনেক নারী চরিত্র অনুধাবনের মওকা পেয়েছিলাম কিন্তু সিতারার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা যখন আমার কানে আসতে লাগল তখন আমি অবাক হয়ে পড়লাম। সে নারী নয়—প্রলয়ংকরী ঝড় অথবা দানবী। যে সব কঠিন রোগ তার হয়েছিল যদি তার শত ভাগের এক ভাগও আর কোন মেয়ের হত তাহলে সহজেই সে অক্কা পেত। তার মনোবল ছিল অত্যধিক এবং সে রীতিমত শরীরচর্চা করত।

তাকে সকালে উঠেই কমপক্ষে এক ঘন্টা নাচের মহড়া দিতে দেখেছি আমি এবং এই মহড়াও যেমন তেমন মহড়া নয়—একঘন্টা একনাগাড়ে নাচলে হাড় গুড়িয়ে যাবে কিন্তু সিতারাকে আমি কোন দিন একটু শ্রান্ত বা ক্লান্ত হতে দেখিনি। ইংরেজীতে যাকে ষ্ঠ্যামিনা বলে সেটা তার মধ্যে প্রচুর ছিল। যার ফলে সে ক্লান্ত হত না। অন্যরা ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়লেও তার একটুও অসুবিধে হতোনা।

সামান্য একটা নাচের জন্য সে যত খাটতো অপর কোন নর্তকী সারাজীবনেও খাটতে পারতনা। তার চরিত্রে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, সব কিছুতেই একটা নতুন কিছু করবার ইচ্ছা।

চালচলনে একটা নর্তকীর মধ্যে যে সব গুন থাকা দরকার—তার মধ্যে তা বেশী পরিমানেই ছিল। এক সেকেন্ডের জন্যও সে শান্ত হয়ে বসতে পারতো না। তার সারা দেহের শিরা উপশিরা গুলো যেন সব সময় স্পন্দিত হতে থাকত, চাঞ্চল্যে ভরে থাকতো। শোনা যায়, সিতারার বাড়ী নেপালে। এ বিষয়ে আমি বেশী কিছু জানিনে। কিন্তু এতটুকু জানি যে, তার আরও দুই বোন আছে—এই ত্রিশূল একইভাবে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। তারা আর অলকানন্দা তো এখন প্রায় হারিয়েই গেছে, আমার মনে হয় তাদের নামও হয়তো আজ আর কারো মনে নেই।

এই তিন বোনের জীবনই খুব চমকপ্রদ। তারার সাথে যে কয়েকজন পুরুষের সংসর্গ হয় তার মধ্যে একজন হলেন শওকত হাশেমী। কিছুকাল আগেই তাঁর স্ত্রী পূর্ণিমা তালাক নিয়ে চলে গেছে, এর কারন সম্পর্কে সে অত্যন্ত বেদনাদায়ক কাহিনী বিবৃত করেছে। অলকানন্দাও কয়েক হাত বদল হয়ে শেষে প্রভাত টকিজের খ্যাতনামা অভিনেতা বলবন্ত সিংএর হাতে গিয়ে পড়ে। তার কাছে সে এখনও আছে কিনা তা আমার জানা নেই।

এই তিন বোনের পুরো রোয়েদাদ যদি আলাদা করে লেখা হয় তা দিয়ে হাজার হাজার পৃষ্ঠা মসীলিপ্ত করা সম্ভব। লোকে আমাকে গালাগালি দেয় যে, আমি অশ্লীল লেখক, মুখপোড়া। কিন্তু তাঁরা একটু তলিয়ে দেখেননা যে, এই দুনিয়ায় কেমন লোকদের সঙ্গে আমাদের পালা পড়েছে। এসব লোকদের আমি অশ্লীল মনে করিনে। আমারতো মনে হয়, মানুষ তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয় অথবা তার বন্য আদিম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য এমন হয়।

তারা, সিতারা ও অলকানন্দা হয়তো কোন লোকের ঔরসজাত কন্যা, সম্ভবতঃ নেপালের কোন গ্রামে তাদের জন্ম। সেখান থেকে একে একে তারা বোম্বে এসে পৌছল সিনেমা জগতে অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্যে। ব্যাপারটা ছিল অদৃষ্টের, তাই শুধু সিতারার নক্ষত্রই উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বাকী দু'জন মিট মিট করে জ্বলে নিভে গেল।

সিতারার কথা চিন্তা করলেই আমার বোম্বের পাঁচতালা দালানের কথা মনে হয়। যার মধ্যে অনেক কামরা থাকে। কারণ

সিতারাও একই সময়ে তার মনের কুঠুরীতে বহু পুরুষের জায়গা দিয়ে থাকে। আমি যতদূর জানি, যখন সে বোম্বে আসে তখন তার সংগে একজন গুজরাটি ফিল্ম ডাইরেক্টরের ভাব হয়। তার পুরো নামটা আমার মনে নেই। তবে তাকে দেশাই বলা হতো। শীর্ণকায় দুর্বল আধমরা গোছের চেহারা। কিন্তু খুবই দক্ষ লোক ছিল। নিজের কাজে বেশ হুশিয়ার কিন্তু তার অদৃষ্ট অনুকূল ছিল না। যেহেতু লোকটা নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিল তাই সর্বত্রই তাকে ঠোকর খেতে হয়েছে। তার সংগে আমার যখন দেখা হয় তখন সরোজ ফিল্ম কোম্পানীর অস্তিত্ব কোন রকমে টিকে ছিল। সে টিকে থাকাও মরার মতই। খুব দ্রুত ঘনিষ্টতা জমে ওঠে আমার সাথে। কারণ, লোকটার ছিল সাহিত্যের বাতিক। সেই সময়ই আমি জানতে পারি যে, সিতারা তার স্ত্রী কিন্তু সে তাকে পরিত্যাগ করেছে। দেশাই-এর কিন্তু এই বিচ্ছেদে কোন দুঃখ ছিল না। সে আমাকে জানাল যে, সে তার সংগে এঁটে উঠছিল না।

হিন্দু ধর্মের নিয়মানুসারে কোন মেয়ে তালাক নিতে পারে না। দেশাই-এর সাথে সিতারার বিয়ে হয়েছিল হিন্দু আইনে, তাই সে তখনও মিসেস দেশাই বলে পরিচিত ছিল। যদিও সে পর পুরুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে দেশাইকে পরিত্যাগ করে গিয়েছিল। তখনকার উঠতি ডাইরেক্টর মেহবুবের ছবিতে কাজ করবার জন্য একবার সিতারাকে মনোনীত করা হলো। সেখানে যাওয়া মাত্রই মেহবুবের সঙ্গে সিতারার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একবার আউটডোর সুটিং-এ মেহবুবকে সদল বলে হায়দ্রাবাদ যেতে হয়—সেখানে তিনি নিয়মিত নামাজও পড়তেন এবং সিতারার সাথে শয়নও করতেন। এ সব কথা লিখতে আমার সংকোচ হচ্ছে। কারণ, সিতারার 'কেস হিট্রি' কোন বিশেষজ্ঞেরই লেখা উচিত ছিল। বোম্বেতে তখন ফিল্মসিটি বলে একটা স্টুডিও ছিল। মেহবুব সেখানেই তার ছবি তৈরী করছিল। সেখানে ছিল খ্যাতনামা সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট (বর্তমানে বিখ্যাত প্রডিউসার) পি এন অরোরা নামে একজন কর্মী যুবক। দিল্লীর রিয়াসত পত্রিকার সম্পাদকের ভাষায় সিতারার সঙ্গে পি এন অরোরারও গ্রন্থি বাঁধা ছিল।

মেহবুবের ফিল্ম শেষ হল। ততদিনে সিতারা পি এন অরোরার কাছে স্ত্রী বা রক্ষিতারূপে বাস করতে লাগল। কিন্তু ইতিমধ্যে আরেকটি ব্যাপার ঘটে গেল। ফিল্ম সিটিতে (অথবা অন্য কোন কোম্পানী হবে যেখানে সিতারা কাজ করত) একটা নতুন চেহারার আবির্ভাব হল। তার নাম আল নাসের। অত্যন্ত সুদর্শন তরুণ যুবক। সদ্য দেরাদুন থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে এসেছিল। গাল দুটোর রং ছিল দুধে আলতায় মেশানো। তার শখ হল সিনেমায় কাজ করবে।

আসা মাত্রই সে একটা ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ পেল। দৈবক্রমে সেই ছবিতে সিতারারও ভূমিকা ছিল। সে তখন একই সঙ্গে মেহবুব, পি, এন, অরোরা ও তার আসল স্বামীর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল।

কিন্তু সিতারার সঙ্গে নাজিরেরও সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল যখন নাজিরের প্রথম ইহুদী রক্ষিতা ইয়াসমিন তাকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। জানি না এদের মিলন ঘটল কি করে। তবে তাদের মধ্যে গভীর প্রেম ছিল।

নাজিরকে আমি ভাল করেই জানি। সে অত্যন্ত বদমেজাজি লোক ছিল এবং মেয়েদের সে নিজের কবজায় রাখবার চেষ্টা করতো।

তাকে মানুষ না বলে একটা দৈত্য বলা ভালো। তবে বড়ই সরল অন্তকরণের অধিকারী ছিল। সে আমার একজন বন্ধু। সাক্ষাৎ হলে সালাম দেওয়ার পরিবর্তে গালাগালি দিয়ে সে আমাকে সম্বর্ধনা করত। কিন্তু আমি জানতাম, তার মন ছিল খুব সাদা ও সরলতায় পূর্ণ।

এই সরল চেতা অকপট লোকটি সিতারাকে কয়েক বছর পর্য্যন্ত সহ্য করে আসছিল। তার কড়া মেজাজের জন্য সিতারার এত সাহস হয়নি যে, সে তার পুরনো বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। কিন্তু যে মেয়ে একপুরুষে তৃপ্ত নয় তাকে সামলাবার উপায় কি? অরোরা, আল-নাসের মেহবুব, তার স্বামী দেশাই—সবার সঙ্গেই তার ভাব বজায় ছিল। এ ব্যাপারটা নাজিরের কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগল। হলে কি হবে সিতারা তো অন্য ধাতুতে গড়া মেয়ে। তাকে বাগে রাখা খুবই কঠিন ছিল।

ওদিকে ইয়াসমিন ছিল মধ্যম প্রকৃতির মেয়ে। সুন্দরী এবং পরিপূর্ণ এক নারী।

সে নাজিরকে বলল যে, সে বিয়ে করে সংসারী হতে চায়। তখন নাজির নিরুপায় হয়ে যে কোন মেয়েকে সে বিয়ে করতে পারে বলে ইয়াসমীনকে জানাল।

তবে এটা আমি বুঝতে পারিনে যে, নাজির আর সিতারার সম্পর্ক এত দীর্ঘ-স্থায়ী হয়েছিল কি করে? নাজিরের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় হিন্দুস্তান সিনেটোনে। তখনকার দিনে এই ইণ্ডাস্ট্রির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। কারণ, ফাইনান্সার ছিল শেয়ার মার্কেটের জুয়াড়ী—আজ লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক—কাল দেখা গেল দেউলিয়া হয়ে গেছে।

একদা আমি কিচড় (কাদা) নামে একটা গল্প লিখেছিলাম, সেটা পানুভাই দেশাইকে পড়ে শোনাবার পর তিনি তা পছন্দ করলেন। তখন সরকারের তরফ থেকে যে সব কঠোর নিয়ম-কানুন প্রচালিত ছিল, তাতে কোন প্রতিষ্ঠান আমার গল্পটা চিত্রায়িত করতে সাহসী ছিলনা। কিন্তু শেঠ পানু ভাই খুব সাহসী লোক ছিলেন। তিনি আমার কাহিনীটা নিয়ে নিলেন। কিন্তু পরে আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ নিরুপায় হয়ে সে প্রয়াস ত্যাগ করলেন।
নাজিরের জন্য আমি শ্রমিকদের নিয়ে একটা গল্প লিখে দিয়েছিলাম। যখন সে জানতে পারল যে, আমার এই বিলম্বী ছবিটি তৈরী হবে না তখন সে শেঠ পানু ভাইকে বলল যে, আপনি সেই গল্পটা আমাকে দিয়ে দিন, আমি আমার সব কিছু বিক্রি করেও এই ছবিটা তৈরী করব। কিন্তু তাও শেষে হল না।

সুতরাং কোন প্রকারে পুঁজির যোগাড় হয়ে গেল। এ ছবির ডাইরেক্টর ছিল দাদ্রা গজ্জাল। জাতে গুজরাটি। ছবি তৈরী হয়ে রিলিজ হয়ে গেল। লোকে প্রশংসাও করল, কিন্তু আমি সন্তুষ্ট হলাম না। ছবির সাথে আমার গল্পের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই সময়েই নাজির তার ব্যক্তিগত কোম্পানী গড়বার জন্য হন্যে হয়ে উঠে এবং এ সময়েই ইয়াসামিন তার কাছ থেকে বিদায় নেবার প্রস্তুতি গ্রহন করে। নাজির খুব তাড়াতাড়ি নিজস্ব কোম্পানী তৈরী করল। আমার যতদূর মনে পড়ে, তার পয়লা ছবির নাম ছিল 'আন্দেসা'।

তারপর সে তার দ্বিতীয় ছবিও তৈরী করল। সম্ভবতঃ তার নাম ছিল 'সোসাইটি'। সে ছবিতে সে সিতারাকেও একটা চরিত্র দিয়েছিল।

এবার একটা ঘটনা শুনুন, বোম্বে ছেড়ে দিল্লী যেতে হল। সেখানে আমি অল-ইণ্ডিয়া রেডিওতে একটা চাকুরী নিয়েছিলাম। প্রায় বৎসরকাল যাবৎ আমি বোম্বের সিনেমা জগৎ সম্পর্কে কোন খবর রাখতাম না। একদিন হঠাৎ নয়াদিল্লীর রাস্তায় অরোরার দেখা পেলাম। হাতে মোটা ছড়ি, পেট বেড়ে গেছে, এমনিতেই লোকটা একটু নাদুস নুদুস ধরনের। কিন্তু বর্তমানে তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ মনে হচ্ছিল। অতি কষ্টে হেঁটে চলছিল, যেন নিষ্প্রান দেহ নিয়ে কোন রকমে চলছে। বোধ হয় বেড়াতে বের হয়েছিল। আমি গাড়ি থামিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার, চেহারা এত খারাপ হয়েছে কেন? সে হাঁপাতে হাঁপাতে একটু শুকনো হাসি হেসে বলল,—'সিতারা—মান্টো, সিতারা'।

আসলে সিতারা এক রহস্যময়ী বিচিত্র ধরনের মেয়ে। এমন মেয়ে লাখের মধ্যে দু' তিনটে পাওয়া যায়। আমি জানতাম যে, সে কয়েকবার মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। এমন কঠিন রোগের শিকারে সে পরিণত হয়েছিল যে, সাধারণ মেয়ে হলে তার পক্ষে বাঁচা সম্ভব হত না। কিন্তু তার এত কঠিন প্রাণ ছিল যে, প্রতিবারই মৃত্যুকে ঠেকিয়ে আসছিল। এত রোগ ভোগের পর সবাই মনে করেছিল যে, তার নাচের ক্ষমতা আর থাকবে না। কিন্তু তারপরও সে তার যৌবনের চাঞ্চল্য নিয়েই নেচে চলল বরাবর। প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা সে নাচের রিয়াজ করত, মালিশওয়ালাকে দিয়ে তেল মালিশ করাতো। তার ঘরে দুটো চাকর ছিল। তার মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন মেয়ে লোক। সাধারণত পুরুষ চাকরটা হত তার মালিশওয়ালা আর মেয়ে চাকরানীটার পরনে থাকত মলমলের পাতলা শাড়ী—সেটা এত পাতলা যে, তার শরীরের সব কিছু পরিস্ফুট ছিল এবং দর্শকদের কাছে সেটা বড়ই অশোভনীয় আর দৃষ্টিকটু মনে হতো। সে কথা বলত কম কিন্তু দৃষ্টি ছিল প্রখর। যদিও তার বয়স ছিল পঞ্চান্ন বছরের মত কিন্তু সে একজন তরুণীর মত চঞ্চল ও কর্মঠ ছিল। তার চোখ দুটোও ছিল বাজপাখীর মত।

আজকাল নাজির স্বর্ণলতার সঙ্গে জুটি বেঁধেছে কিন্তু সে বহু দিন যাবৎ সিতারাকে সহ্য করেছে।

সে যখন বুঝতে পারল যে, সে সিতারার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না তখন একদিন সিতারাকে জোড়হাত করে বলল: 'সিতারা আমাকে রেহাই দাও। আমার ভুল হয়ে গেছে। এ জন্য আমি খুব দুঃখিত এবং তোমার কাছে ক্ষমা চাই।'

নাজির সিতারাকে মারপিটও করত; এতে সিতারা কিছু মনে করতোনা।

যে সময়ে সিতারা নাজিরের রক্ষিতা ছিল তখন নাজিরের ভাগ্নে কে আসিফ (বর্তমানে বিখ্যাত পরিচালক) মামার কাছে থাকত। কে আসিফ অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান হৃষ্টপুষ্ট আর শক্তিমান যুবক ছিল। মেয়েদের সঙ্গে এপর্যন্ত তার মোকাবিলা হয় নি। মামার সঙ্গে থাকত এবং চিত্রশিল্প সম্বন্ধে তালিম নিত। অন্তরে ছিল অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা আর তার উপর সিনেমা জগতে এসে সে মেয়েদের (তাও অভিনেত্রীদের) সান্নিধ্য লাভ করল। তাছাড়া সে তার মামা নাজির আর সিতারার সম্পর্কটাও স্বচক্ষে দেখছিল। কে আসিফের তখন যৌবনকাল। এসময়ে তারুণ্যের উচ্ছলতায় মানুষ শক্ত দেয়ালের সাথেও লড়তে পিছ পা হয় না। আর সিতারাও ছিল সত্যিকারের একটা পাথরের দেয়াল—সে যে কোন শক্তিমান পুরুষের সাথে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য সদা-প্রস্তুত ছিল।

নাজির তখন রঞ্জিৎ ফিল্মের সামনেই একটা বাড়ীতে থাকত। বড়ই নোংরা জায়গায়। পুরো একটা ফ্লাটই নিয়ে রেখেছিল নাজির। এখানেই তার প্রতিষ্ঠিত হিন্দ পিকচার্স এর অফিস ছিল। অতএব স্বল্প পরিসরে গোপনীয়তা রক্ষা করা কি করে সম্ভব?

যুবক আসিফের পক্ষে একটা নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। সে তার বিবাহিত বন্ধুদের কাছে দাম্পত্য জীবনের সম্পর্কে বহুকিছু শুনেছিল। সে মনে করতে লাগল, এসব প্রেম ভালবাসা বাজে কথা। আসলে মানুষ একটা হিংস্র প্রাণী—এবং তার দৈহিক মিলনই হচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর গোছের কুশতি।

এ সময় নাইয়ারও (পাকিস্তানের প্রতিভাবান কিন্তু হতভাগ্য চিত্র-পরিচালক) নাজিরের সাথে থাকতো। আসিফ আর নাইয়ার দু'জনই

সমবয়েসী। দু'জনই অবিবাহিত এবং স্বপ্নের জগতে বিচরণ করত। কিন্তু সিতারার কথা উঠলে দু'জনই কেঁপে উঠত—এবং দু'জনেরই মন তখন এমন এক দুনিয়ায় চলে যেত যেখানে শুধু দৈত্য দানা আর ডাইনীরা বাস করে।

খুব ভোরে উঠেই সিতারা পাশের কামরায় রিয়াজ শুরু করে দিতো। এও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। সকালে উঠেই বন্য—প্রাণীর মত দু'ঘন্টা ধরে নাচ চলতো তার। তবলচির হাত অবশ হয়ে যেত,—কিন্তু তার কিছুই হত না। রিয়াজের পর সে মালিশ করাতো। তারপর স্নানান্তে সে নজিরের ঘরে যেত। নজির তখনও ঘুমিয়ে থাকত। তাকে জাগাত, তারপর তার হাতে একটা দুধ না কিসের পেয়ালা থাকত সেটা জোর করে তাকে খাওয়াতো এবং আর একটি মহড়া শুরু হত তখন। এ সবই আসিফ ও নাইয়ারের জ্ঞাতসারেই ঘটত।

নাজিরের আত্মীয় হওয়ার দরুণ সিতারা আসিফের কাছেও বসত। ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করত। ক্রমে আসিফের লজ্জাও কেটে যেতে লাগল। এই সময়ের মধ্যে সে বুঝতে পেরেছিল যে, সিতারা তার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

দুটো গাড়ীর সামানা-সামনি সংঘর্ষ ঘটবার পূর্বের মত তারা। একই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু একটু ব্যবধান ছিল মাঝে। সে অতি সামান্য ব্যবধান। অতঃপর আসিফও সেতারার অন্যান্য পুরুষদের তালিকায় স্থান পেলো।

শেষকালে নাজির সিতারার এ হেন কাজকর্ম আঁচ করে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। অনেক প্রহার ও বকা ঝকা করার পর সে সিতারাকে বলল, "তুমি আর এখাতে থাকতে পারবে না। এক্ষুনি এখান থেকে পালাও!"

সিতারা আর যাই হোক মেয়ে লোকতো! নাজিরের কাছে প্রহৃত হয়ে তার দেহে আর এমন শক্তি ছিল না যে, সে একা একা তার মালপত্র নিয়ে চলে যায়।

আসিফই তার বিছানাপত্র বেঁধে তাকে সঙ্গে করে দাদরের খুদাদাদ সার্কেলে সিতারার বাড়ীতে পৌঁছে দিতে গেল।

ঘরে পৌঁছে সিতারা আসিফকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিল। আসিফও অত্যন্ত সাঁহসের সাথে সিতারার হাত চেপে ধরল এবং বলল,—ধন্যবাদের কি দরকার ছিল সিতারা—

সিতারা আসিফের মুষ্টি থেকে তার হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করল না। কিছুক্ষণ রসালাপ চলল, সিতারা আসিফকে সেই মোহনীয় মন্ত্রেও দীক্ষা দিল— যা সে এতদিন ধরে শত শত রোগা-পটকা, মোটা তাজা, অভিমানী ও বর্বর স্বভাবের লোকদের দিয়ে এসেছে।

আসিফ খুদাদাদ সার্কেলের সেই বাড়ীতে দিনের আলো দেখতে পেল। আজ তার খুশীর দিন। কিন্তু তবু সে মনে স্বস্তি পাচ্ছিল না। সে সিতারাকে বলল, 'দেখ, তোমার আমার সম্পর্কটা পাকা-পোক্ত হওয়া দরকার। সকল ঘাট রেখে এক ঘাটে তোমার তরী ভিড়াও।'

সিতারাও তাকে কথা দিল, সে আসিফ ছাড়া আর কারো দিকে চোখ তুলেও দেখবে না। এবার আসিফ শান্ত হল। কিন্তু নাজির যদি আবার জিজ্ঞেস করে যে, এত দেরী হলো কেন, সেই ভয়ে সত্যিকার প্রেমিকের মত সে সিতারার হাতে চুমু খেয়ে চলে গেল এবং কথা দিয়ে গেল সে পরদিন অবশ্যই আসবে।

আসিফ চলে যেতেই সিতারা উঠল, ড্রেসিং-টেবিলের কাছে গিয়ে চুল আচড়ালো, প্রসাধন করল, তার পর শাড়ীটা বদলে কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিচে নেমে গেল এবং ট্যাক্সী চেপে পি এন অরোরার বাসায় গিয়ে পৌছল।

এখানে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলি। সিতারা আমাকে খুবই ঘৃণা করত। আমি মুসাব্বির-এর সম্পাদক ছিলাম। আর বল্গাহীন ভাবে লিখতাম। 'বাল কি খাল' ও 'নিতনয়ী' শীর্ষক স্তম্ভে আমি কয়েকবার সুক্ষ নৈপুণ্যের সাথে তাকে নাকাল করে ছেড়েছিলাম। তারমধ্যে কোন অশ্লীল কথা ছিল না। তবু সে বীতশ্রদ্ধ ছিল। তবে তাকে আমি মোটেই পরোয়া করতাম না। কারণ আমার তো তাকে দিয়ে কোন কাজ নেই। এছাড়া এমনিতেও আমি ফিল্ম লাইনের মেয়েদের কাছ থেকে দূরে দূরেই থাকতাম।

তারপর যখন আমার গুপ্তচরদের মারফত তার সাথে আসিফের গোপন প্রেমের খবর পেলাম তখন আমিও ইশারা ইঙ্গিতে তা লিখতে শুরু করলাম। এবার সে মারমুখো হয়ে উঠলো। আসিফকে বলল, 'তুমি লোকটাকে পিটাই করছো না কেন? নিজে না পার আর কাউকে দিয়ে মার দাও। নয়তো অপর কোন কাগজওয়ালাকে বল তারা যেন ওকে খুব করে গালাগালি দেয়।'

ব্যাপার ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল। আপনারা তো বুঝতে পারছেন যে, সিতারা কোন ধরনের মেয়ে। কোন পুরুষের সঙ্গে সে একবার সম্পর্ক স্থাপন করলে তার আর রক্ষা নাই। শুধু এক আলনাসেরই ছিল যে তার সাথে কয়েক মাস বাস করবার পর দেরাদুনে পালিয়ে গেল। নয়তো একদিন তার পাকস্থলীও বেকার হয়ে যেত এবং বোম্বের কবরস্থানেই তার শেষ শয্যা রচিত হত।

নাজিরের মনে সিতারার জন্য কোন অনুতাপ ছিল না। সে এমন লোকই নয় যে, নিজের সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্যুত হবে। সে সিতারার জন্য কোন চিন্তা করত না, চিন্তা করতো আসিফের জন্য। নিজের বোনের ছেলে—পরম স্নেহভাজন এবং তাকে মানুষ করার জন্য সে এখানে নিয়ে এসেছিল।

সিতারার সাথে যদি কোন পুরুষের সংসর্গ হয় আর সিতারা যদি তাকে যোগ্য বলে মনোনীত করে তাহলে রাতদিন চব্বিশ ঘন্টার অধিকাংশ সময়ই তার সঙ্গে কাটাতে হয়। নাজির তো আসিফের অনুপস্থিতির জন্য এমনিতেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলে পাছে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়।

আসিফ একদিন সত্যি ধরা পড়ল। কিন্তু আসিফ তার মামাকে কসম খেয়ে বলতে লাগল যে, তারা নির্দোষ—তাদের মধ্যে এমন কোন মন্দ সম্পর্ক নেই। কিন্তু নাজির তখন ছাড়বার পাত্র ছিল না। মনে হচ্ছিল মেরে দু'জনেরই হাড় গুড়িয়ে দেবে সে। কিন্তু মজিদ (বিখ্যাত অভিনেতা বর্তমানে পাকিস্তানে আছেন) অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত ব্যাপারটা সামলে নিলেন।

মজিদ আসিফ ও সিতারার এই গুপ্ত প্রেম সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ছিল। সে কয়েকবার আসিফকে সতর্কও করে দিয়েছিল যে, এই বিপদজনক কাজ থেকে সে যেন বিরত থাকে। কিন্তু যৌবনের

পাগল করা দিনগুলো সে অতিক্রম করছিল। কোন নিষেধ সে শুনল না। আসিফ তার ভাগ্নে। লোকে বলে, এই আত্মীয় সম্পর্কের জন্যই নাজির সিতারার সঙ্গে তার মিলন পছন্দ করতো না। কিন্তু আমিতো আসিফের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিটি দিক সম্পর্কে ওয়াকিফহাল—আমি এ কথা জোরের সঙ্গেই বলতে পারি যে, নাজিরের জায়গায় যদি অন্য কোন লোকও হত, তাহলেও একই মনোভাব গ্রহণ করত।

নাজির মজিদের কথায় সিতারা ও আসিফকে তখনকার মত রেহাই দিল। কেননা, আসিফ তার মামার কাছে কসম খেয়ে বলেছিল যে, তাদের উভয়ের মধ্যে অতি পবিত্র সম্পর্ক।

ব্যাপারটা এমনি করেই গড়িয়ে চললো। নাজির আর আসিফের সম্পর্কে ফাটল ধরতে লাগল।

আমি একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সিতারা যখন নাজিরের কাছ থেকে তল্পিতল্পা বেঁধে চলে গেল, তখন বিখ্যাত সঙ্গীতকার রফিক গজনবী তাদের মধ্যে পুনর্মিলনের ব্যবস্থা করেছিল। সে সিতারা, অরোরা এবং নাজিরকে নিজের বাসায় ডেকে আনল।

এবার সিতারা আর আসিফের কথা বলি। সিতারা তাকে মনে প্রানে কামনা করত। তার জীবনে সিতারাই হয়ত প্রথম নারী ছিল।

আসিফ পলায়ন করল একদিন। পর দিন জানা গেল, সিতারাও পালিয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, তারা কোন তীর্থ ভ্রমনে বের হয়েছে। যদি হজের সময় হত তাহলে বন্ধুরা বলত যে, আসিফ মিয়া হজ করতে গেছে।

কিন্তু হঠাৎ দিল্লী থেকে খবর পেলাম যে, সিতারা পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছে। তার ইসলামী নাম হল আল্লারাখা। আরও খবর হলো আসিফ তাকে শরিয়ত মোতাবেক বিয়ে করেছে।

তার মামা নাজিরের এখবর শুনে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা আপনি নিজেই আঁচে করতে পারছেন।

এ সংবাদ যখন নির্ভরযোগ্য বলে মনে হল তখন আমি প্রাণ খুলে "মুসাব্বির" পত্রিকায় লিখতে শুরু করলাম। প্রায় প্রতিসপ্তা-

হেই এই নব দম্পতিকে নিয়ে লিখতাম—এর মধ্যে বিদ্রুপবাণ থাকত এবং রুচিশীল আনন্দও থাকত।

মধুচন্দ্রিমা যাপনের পর যখন এই নবদম্পতি বোম্বে ফিরে এল তখন নাজির মনের জ্বালা মনেই চেপে রাখল। একবার আমাকে রেস-কোর্সে যেতে হয়েছিল। আমি দেখলাম যে, ভিড়ের মধ্যে থেকে স্যুট পরা আসিফ আসছে—তার এক হাতে সিতারার কোমরটা। দেখা হতেই সে হেসে উঠল—তারপর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "বাহ্ মান্টো ভাই বেশ লিখছ। এত সুন্দর তোমার 'নমক মরিচ' 'বালকি খাল' কলাম। খোদার কসম—তার তুলনা হয়না।"

সিতারা ভ্রূ কুঁচকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল; কিন্তু আসিফ আমার সাথে বেশ হাসিখুশীভাবে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ করতে লাগল।

এখন বোম্বের প্রতিটি লোক অর্থাৎ যাদের সিনেমা সম্বন্ধে আগ্রহ ছিল তারা জানতে পারল যে, কে একজন আসিফ সিতারাকে বিয়ে করেছে। ভেণ্ডি বাজার আর মুহম্মদ আলী রোডে যে সব ইরানী হোটেল আছে—সেখানে উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের মুসলমান—বিশেষ করে যারা মুসলীমলীগের সমর্থক তারা এ নিয়ে চায়ের পেয়ালায় ঝড় তুলতে লাগল, 'মিয়া ভাই, (মুসলমান) একজন কাফের মেয়েকে মুসলমান করে তাকে বিয়ে করেছে।'

কেউ মন্তব্য করল: আসিফের এখন ঐ শালীকে দিয়ে আর অভিনয় করানো উচিত নয়।

কেউ বলল: কোন ক্ষতি নেই তবে যখন বাইরে আসবে তখন যেন পরদা করে।

কেউ বলল: ছাড় এসব—এতো একটা স্টান্ট।

আসিফের নিজের বাড়ী ছিল। তারা সেই খুদাদাদ সার্কেলেই (দাদর) থাকত পরমানন্দে —সিতারার মোটর ছিল, তাতে করে ঘুরে বেড়াত দু'জনে।

আমার মনে হয়, দিল্লীতে একবার আসিফ লালা জগৎ নারায়ণকে ধরেছিল তাঁকে একটা ছবি তৈরি করে দেবে বলে। হয়তো তার কাছ থেকে অগ্রিমও নিয়েছিল কিছু টাকা—যার ফলে তাদের কোন অভাব ছিল না।

আসিফের একটা মস্ত গুণ হচ্চে যে, সে দারুণ আত্মবিশ্বাসী। আর তার মধ্যে হীনমন্যতা মাত্রও ছিল না। সে বড় গল্প লেখক ও ডাইরেক্টরদের অতিষ্ঠ করে তুলত এ শুধু তার খোদাপ্রদত্ত বুদ্ধিমত্তার গুণে। আসিফ যখন ডাইরেক্টর হল তখন সে অপরাপর ডাইরেক্টরদের মত নিজের চিন্তাশক্তিকে নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখল না। সে প্রত্যেক প্রতিভাবান লোককেই নিমন্ত্রণ জানাত, তারা যাতে তাকে ভালো উপদেশ দিতে পারে।

আসিফ তখন 'ফুল' তৈরি করছিল। আমি ক্লেয়ার রোডের একটা ফ্লাটে থাকতাম। একদিন গাড়ীর হর্ন বাজতে শোনা গেল ঘন ঘন। আমি ব্যালকনিতে এসে নিচে চেয়ে দেখি, একটা বিরাট মোটর গাড়ী। আসিফ পেছনের সিটে বসা—জানালা দিয়ে তার মোটা মাথাটা বের করে হাসল। আমি বললাম ঃ "কি ব্যাপার, ভেতরে এসো।"

সে দরজা খুলল এবং পেছনের সিটে বসা সিতারাকে কি যেন বলল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল ঃ "এখনি এসে সবকিছু বলছি।"

আমি দরজা খুললাম। আসিফ ভেতরে এসে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আমার করমর্দন করে বলল ঃ আমি তোমাকে আমার একটা গল্প শোনাতে এসেছি।

আমি ঠাট্টার সুরে বললাম ঃ "তুমি জান যে আমি এসব ব্যাপারে 'ফি' নিয়ে থাকি।"

আসিফ আর কোন কথা না বলে উল্টো পায়ে কামরা থেকে বের হয়ে গেল। আমি কত ডাকলাম তাকে, পেছনে দৌড়ে গেলাম, কিন্তু সে কোন কথাই শুনল না। শুধু বলল সে ফিস নিয়ে এসে তবে কাহিনী শোনাবে।

আমি ওপরে এসে ব্যাপারটা আমার স্ত্রীকে বললাম। সে বলল যে, এটা তোমার বোকামী হয়েছে। কারণ, আসিফ তো তোমার তেমন বন্ধু নয়। এ কথাও সত্যি—কারণ তার সাথে আমার বেশি খাতিরও ছিল না। যেহেতু সে এবং আমি উভয়েই অকপট, অত্যন্ত রুক্ষভাষীও বলা যায়—তাই যখন আমি তাকে

"ফি" দেওয়ার কথা ঠাট্টা করে বললাম, তখন এতটা বুঝিনি এটা তাকে আহত করবে।

আমি কোন কোন ডাইরেক্টরের বাজে গল্পও চার চার বার শুনেছি। তারা আমার মতামত জানতে চাইত। তাদের কাছ থেকে আমি কোন দিনই সময়ের দাম নিইনি। আমি তার কথাই ভাবছিলাম। আমি তাকে ক্ষুণ্ণ করেছি এজন্য দুঃখও হচ্ছিল। এমন সময় দরজায় ঘা পড়ল। দরজা খুলে দেখি একটা লোক দাঁড়িয়ে—সে আমার হাতে একটা খাম দিয়েই চলে গেল। খাম খুলছিলাম এমন সময় নিচে থেকে মোটরের হর্ন শুনলাম। ব্যালকনি থেকে দেখলাম সিতারার গাড়ী আমাদের বাড়ীর সীমানা ছাড়িয়ে ভোঁ করে বের হয়ে গেল।

খাম খুলে দেখলাম একশ' টাকার পাঁচটা নোট। তার সাথে ছোট্ট একটা চিরকুট। তাতে লেখা আছেঃ 'ফি পাঠালাম, আমি কাল আসব।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। পরদিন সকালে ন' টায় সে গাড়ী করে এল। সিতারা সাথেই ছিল, কিন্তু সে এল না। আসিফের কড়া নাড়ার দরকার হলনা। কারণ দরজা খোলই ছিল। আমি তাকে স্বাগত জানাবার জন্য বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

সে আমকে দেখেই বললঃ "কি ডাক্তার সাব, "আপনার "ফি" পেয়েছেন তো।"

আমি খুব লজ্জিত হলাম। আমার ব্যবহারের জন্যে আমি তার কাছে ক্ষমা চাইলাম এবং তার দেওয়া পাঁচ শো টাকা ফেরত দিতে চাইলাম।

আসিফ তার বিশিষ্ট হাসি হেসে সোফায় ঠেস দিয়ে বসে বললঃ মান্টোসাহেব, আপনি কি ভাবছেন, এ পয়সা আমার, না আমার বাপের। অফিসের পয়সা। আমার ভুল হয়েছিল যে, আমি বিনা পয়সাতেই এখানে এসে পড়েছিলাম।

সে আমাকে আর বলবার অবসর দিল না। বড় সোফার ওপর বসেছিল আসিফ, আর আমি তার সামনে একটা চেয়ারে বসলাম। আসিফকে আমি কোনদিন কোন গল্প শোনাতে বা শুনতে দেখিনি। সে তার জামায় আস্তিন গুটিয়ে নিল, তারপর

প্যান্টের বোতামটা খুলে সোফার ওপর বসল তারপর শুরু করল তার কাহিনী। "আচ্ছা এবার শুনুন তাহলে গল্পটা। নাম ফুল। নামটা কেমন লাগল আপনার কাছে?"

আমি বললাম ঃ "ভালো"

তারপর শুরু করল তার গল্প। খোদা মালুম, সে কাকে দিয়ে লিখিয়েছিল গল্পটা।

কাহিনী শেষ হল। বড়ই লম্বা-চওড়া কাহিনী—একেবারে শয়তানের নাড়ির মত।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আসিফ আমাকে জিজ্ঞেস করল ঃ "কেমন মনে হল গল্পটা আপনার কাছে?"

আমার মুখদিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, "একদম বাজে।"

আসিফ জোরে তার ঠোঁট কামড়ে ধরে বিরক্ত হয়ে সোফায় বসে ঝাঁঝের সাথে বলল ঃ কি বললে? আমি এসব ব্যাপারে সব-সময় দৃঢ়চেতা। সুতরাং আরও জোরের সাথে বললাম ঃ আমি বলেছি যে, একেবারে বাজে গল্প। কথাগুলো আমি জোরের সাথে বলেছিলাম। আসিফ সোফা থেকে নেমে এল এবং আমার হাত ধরে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বলল, "খোদার কসম, একদম বাজে গল্প, আমি তোমার মুখে এ কথাই শুনতে এসেছিলাম।"

বহুদিন অতীত হল। আসিফ আর সিতারা মধুময় দাম্পত্য জীবন যাপন করছে। এখানে আরো একটি কথা মনে পড়ল। যখন আসিফের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়নি এবং সিতারার সাথেও আসিফের সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি তখন আসিফের মুখে প্রায় দশ হাজার কন্টক ব্রণে আচ্ছন্ন ছিল—লোকে বলে যে এটা যৌবনের চিহ্ন। যদি যৌবনের চিহ্ন এত কদর্য ও কষ্টকর হয় তাহলে আমার মনে হয় এমন যৌবন যেন কারও না আসে। আমার বন্ধুদের পরামর্শ গ্রহণ করে আমি ক'টা অষুধও তাকে কিনে দিয়েছিলাম; কিন্তু কোন ফল হয়নি। ব্রন কন্টক আগের মতই ছিল কিন্তু যখনই সিতারার সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠল তখন তিন চার মাসের মধ্যেই তার মুখ-মণ্ডল পরিষ্কার হয়ে গেল। বাকি রইল শুধু দাগগুলো।

আর একটা ঘটনা শুনুন: বোম্বে টকিজে আমি আর কামাল আমরোহী একসঙ্গে কাজ করতাম। তার লেখা কাহিনী চিত্রায়িত করবার জন্য চিন্তা করছিলাম। এই সময়ে তার ডান গালে একটা ব্রণ গজিয়ে উঠল। এ জন্য সে বেশ কষ্ট পাচ্ছিল। সে আমাকে তার কষ্টের কথা জানাল। তাকে বললাম: "একটা খুব সহজ চিকিৎসা আছে। একেবারে অব্যর্থ।

সে জিজ্ঞেস করল: কি সেটা? আমি তাকে বললাম: তুমি সিতারার বাড়ী চেন?

'হাঁ, চিনি।'

"তাহলে এক কাজ কাজ কর, তার বাড়ীর পাশ দিয়ে একবার ঘুরে এসো। কিন্তু দেখ যেন ভেতরে যেওনা।"

কামাল বুদ্ধিমান লোক। আমার রসিকতা বুঝতে পেরে জোরে হেসে উঠল।

বহুদিন যাবৎ আসিফ ও সিতারার দাম্পত্য জীবন যাপন করতে লাগল। সম্ভবতঃ তারা তখন মহমের একটা ফ্লাট নিয়ে থাকত।

কয়েকবার আমার সেখানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। তখন আসিফ 'ফুল' বানিয়ে সম্ভবত 'আনার কলি' তৈরী করছিল। সে গল্পও কামাল আমরোহীর লেখা। কিন্তু সে হয়ত সন্তুষ্ট হতে পারেনি; তাই গল্পের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করবার জন্য সে কয়েকজন কে আমন্ত্রন করেছিল।

সাধারণত সকাল আটটায় আমি তার ওখানে যেতাম।

আমি ভেতরে গিয়ে সোফায় বসতাম। পাশের কামরা—যেটা শোয়ার ঘর—সেখান থেকে এমন ভয়ংকর শব্দ আসত যে, আমার বুক কেঁপে উঠত। কিছুক্ষণ পরই আসিফ এসে হাজির হত। তার অভ্যাস মত ঠোঁট চাটতে চাটতে আসত। তার ভীত সন্ত্রস্ত চেহারা তখন দেখবার মত হত। মলমলের জামা জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। ঘাড় ও বুকে নীল দাগ পড়েছে। চুল এলোমোলো। ঘন ঘন নিঃশ্বাস টানছে। সাধারণ অভিবাদন বিনিময় হত। তারপরই মেঝেয় লুটিয়ে পড়ত। সিতারা আসিফের জন্য একটা পেয়ালা পাঠাত। তাতে কিসের ক্ষীর যেন থাকত। আসিফ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আস্তে আস্তে সেটা খেয়ে ফেলত। তারপর আমাদের কাজ শুরু হত। সে কাজের মধ্যে বেশির ভাগ গল্পই চলত।

আরও বহুদিন অতীত হল। সিতারা আর আসিফের সম্পর্ক পাকাপোক্ত বলেই মনে হল, হঠাৎ একদিন শুনলাম আসিফ তার আত্মীয়-দের একটি মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। দিনক্ষণ ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আসিফ তার বন্ধুদের নিয়ে শীগ্‌গীরই লাহোর যাবে।

হঠাৎ একদিন তার সাথে পথে দেখা হয়ে গেল। আমি সংক্ষিপ্তভাবে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার? সে বলল, 'আমি এই নাটকের যবনিকাপাত করতে চাই, তা হয়তো হয়েই যাবে।'

সেই ঠোঁট চাটতে চাটতে—ভীত সন্ত্রস্ত চেহারা তার তখন দেখবার মত ছিল। কয়েক দিন পরে জানতে পারলাম আসিফ এক বড় পার্টি নিয়ে লাহোর রওয়ানা হয়ে গেছে। তারপর শুনলাম লাহোরে তার বিয়ে খুব ধুমধামের সাথে হয়েছে। তারপর শুনলাম যে, আসিফ তার নববিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে বোম্বে এসে পড়েছে।

বান্দ্রার পালিহিলে একটা বাড়ীর অর্ধেক ভাড়া নিয়েছে সে। কিন্তু পরে জানতে পারিলাম পুরো বাড়ীটা তার মামা নাজিরের দখলে —সে-ই ভাগ্নেকে অর্ধেকটা ছেড়ে দিয়েছে।

আমার মনে হয় তারপর সে 'মুঘলে আজম' ছবির প্রস্তুতি পর্ব চালাচ্ছিল। ছবির কাহিনী ছিল কামাল আমরোহীর, কিন্তু আসিফ তাতে খুশী ছিল না। তাই সে লেখকদের ডেকে শলা-পরামর্শ নিত। কিন্তু তাতেও সে খুশী হল না।

এবার আরেকটা ঘটনার কথা বলি। আসিফ তার আইনানুগ বিবাহিত নববধূর সাথে কয়েকরাত্রি যাপনের পর হঠাৎ একদা রাতের বেলা অদৃশ্য হয়ে গেল এবং সারা রাত সিতারার ঘরে কাটালো। এই বিয়ে বেশিদিন টিকলো না। নাজিরের যুবক পুত্রও ঐ বাড়ীতেই থাকত। জানি না, কেন আসিফ তার স্ত্রীর কাছে যাওয়া ছেড়ে দিল। এর মধ্যে শোনা গেল তালাক দেওয়ার কথাবার্তা চলছে।

আবার আসিফ আর সিতারার মিলন ঘটল। আসিফের বিবাহিতা পত্নী সম্বন্ধেও কয়েকটি মুখরোচক গল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু আমি সে সব কথা বলতে চাইনে। কেননা সে সব গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে আমার ভালো জানা শুনা নেই।

আসিফ তার বিবাহিতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করল। হয়তো তার মধ্যে সে আকর্ষণ ছিল না—যা সে সিতারার কাছে পেত। আমি এ প্রবন্ধ লিখেছি বলে আশা করি, আসিফ আমার ওপর নারাজ হবে না। কেন না সে বড়ই রসিক লোক। সিতারা নিশ্চয়ই নারাজ হবে—কিন্তু একটু পরে সেও আমাকে ক্ষমা করবে। কারণ তার রসবোধও কম নয়। আসলে সে এক বিরাট নারী (যদিও দৈহিক দিক দিয়ে বেঁটে খাটো)। আমি তাকে নারী হিসেবে এমন একজন নারী মনে করি যে এক শতাব্দীতে একবারই জন্মে থাকে।*

*সিতারা আসিফের দাম্পত্য জীবন অবশ্যই শেষ পর্যন্ত টেকেনি। ভারতের অন্যতম খ্যাতিমান চিত্র প্রযোজক পরিচালক কে, আসিফ বর্তমানে দীলিপ কুমারের ভগ্নীর সাথে বিবাহিত জীবন যাপন করছেন।

দুষ্প্রাপ্য বই/ Rare Collection

বইটি সাবধানতা এবং মমতার সাথে ব্যবহার করুন।

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

ব্লাকমেলার দেওয়ান সিং মফতুন

অভিধানে 'মফতুন' শব্দের অর্থ হল প্রেম-বিরহী। এবার এই প্রেমিক প্রবরের বর্ণনা শুনুন। বেঁটে খাটো দেহ, পেট উঁচু মাথা ভারী—তার ওপর বিরল কাঁচা পাকা চুল-থাকে যাকে কেশ বলা মোটেও যুক্তি-যুক্ত নয়। একত্র করলে একজন গোঁড়া বামুনের টিকির মত হবে। গাঢ় শ্যামবর্ণ, ছোট ঘষামাজা দাড়ি। এককালে এই দাড়ি মুখ রক্ষা করেছিল। চোখ দুটো ছোটও নয়, আবার বড়ও নয়। কিন্তু দৃষ্টি ছিল প্রখর ও চঞ্চল।

এই সামগ্রিক গুণের আধার প্রেমিক প্রবর সরদার দেওয়ান সিং মফতুন। ইনি দিল্লীর সাপ্তাহিক রিয়াসতের এডিটর। রাজা-মহারাজা নওয়াবদের দুশমন, তাঁদের গুপ্ত কথা ফাঁস করে দেয়ার সাংবাদিকতায় এক নতুন ধারার প্রবর্তক। তবে এ ব্যাপারে অপক্ক হলেও খুব জোরালো কলমের অধিকারী ছিল সে। বন্ধুর বন্ধু আর দুশমনের জন্য নিষ্ঠুরতম দুশমন দেওয়ান সিং মফতুনকে পুরোপুরি-মিচেলিন টায়ারের বিজ্ঞাপন বলে মনে হতো। পার্থক্য শুধু এই যে, বিজ্ঞাপনে টায়ার দিয়ে তৈরি মনুষ্যাকৃতির কোন গ্রন্থিতে ব্যথা বেদনা নেই, কিন্তু দেওয়ান সিং মফতুনের বাতের ব্যারাম ছিল। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থি ও শিরায় ব্যথা—আপনি তাঁর টেবিলে দোয়াত-কলমের সাথে ক্যুশেন সল্টের বোতল দেখতে পাবেন। এটাও কলম-দানীর একটা অংশ হিসেবে রয়ে গেছে। কখনও হঠাৎ আপনি মনে করবেন, দেওয়ান সিং মফতুন দোয়াতের বদলে ক্যুশেন সল্টের বোতলেই কলম ডোবাচ্ছেন নাকি।

দেওয়ান সিং মফতুনের কোন অঙ্গই যেমন সোজা নয়, তেমনি তাঁর কলমেরও কোন বাক্য সোজা নয়। সাহিত্য শিল্পকে তিনি কতকাল থেকে যে খুন করেছেন, তা কে জানে। কিন্তু

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর মর্য্যাদা "বোম্বে সেন্টিনেলের" পরলোকগত সম্পাদক বি, জি, হার্নিম্যানের সমপর্যায়ের—বরং আমি মনে করি তাঁর থেকেও এক বিঘৎ উঁচু।

হার্নিম্যান শুধু পুলিশের পেছনে লেগে থাকতেন, কিন্তু দেওয়ান সিং বিভিন্ন আখড়ায় তাঁর পাহলোয়ানী মার প্যাচ-দেখিয়েছেন। বড় বড় দেশীয় রাজাদের সাথে পাঞ্জা কষেছেন। আকালিদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন, মাস্টার তারা সিং ও খড়ক সিং-এর সাথে তলোয়ার চালিয়েছেন, মুসলিম লীগের সাথে চারমুখে লড়েছেন, পুলিশকে ত্রিভঙ্গ নাচ দেখিয়েছেন, খাজা গেসু দরাজ হজরত হাসান নিজামীর সাথে বিবাদ করলেন, ত্রিশের ওপর মামলা চালিয়ে প্রত্যেকটিতেই জিতলেন। লক্ষ লক্ষ বরং কোটি কোটি টাকা রোজগার করেন এবং দুহাতে উড়িয়ে দিয়েছেন। অভাবের সময়ে বন্ধুরা এলে তখনই ব্লাকমেলিং করে টাকার ব্যবস্থা করে তাদের আপ্যায়ন করতেন। আর পকেটভরা থাকলে দৌড়ে গিয়ে নগ্ননারীর নাচ দেখতেন এবং বন্ধুদেরও দেখাতেন। নিজে কম পান করতেন, কিন্তু বন্ধুদের আকণ্ঠ পান করিয়ে তৃপ্ত হতেন।

দেওয়ান সিং মফতুন একক নন্, দশক, শতক, সহস্র, অযুত বরং লক্ষ ব্যক্তিত্ব। তিনি একটা যাদুঘর বিশেষ—যাতে হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ দুষ্প্রাপ্য দলিল তালাবদ্ধ রয়েছে। তিনি একটা ব্যাংক, তার লেজারে কোটি কোটি টাকার হিসেব লেখা আছে। তিনি স্কটল্যাণ্ডইয়ার্ড সাদৃশ, যেখানে লক্ষ লক্ষ অপরাধীর গোপন কথা লেখা আছে।

যদি তিনি আমেরিকায় থাকতেন তাহলে সেখানকার সবচে' বড় গ্যাংস্টার হতেন। কয়েকটা খবরের কাগজ তাঁর অধীনে থাকতো, বড় বড় ইহুদী পুঁজিপতি তাঁর ইঙ্গিতে নাচতো, তিনি রবিন হুডেরও বাপ হতে পারতেন। কেননা, দরিদ্রের জন্যে তাঁর সিন্দুক সব সময় খোলা থাকতো। আপনি মফতুনকে দেখলে মনে করবেন, একজন স্বল্পশিক্ষিত প্রৌঢ় বয়স্ক একজন শিখ। কিন্তু তিনি উচ্চশিক্ষিত। একদিন আমি তাঁকে "রিয়াসত" পত্রিকার টেবিলে সুন্দর পেয়াজি রঙের এক কার্ডের ওপর দস্তখত করতে দেখলাম। এধরনের কার্ডের দু'তিনটা স্তূপ দেখা গেল। একটা কার্ড তুলে আমি টাইপ

করা বিষয় গুলো পড়লাম। বিদেশের কোন কোম্পানীর তৈরী দ্রব্যের তালিকা পাঠাতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সব কার্ডের বিষয় বস্তু একই ছিল। আমার খুবই আশ্চর্য মনে হল। এসব মূল্য তালিকা আনিয়ে সরদার সাহেব কি করবেন। জিজ্ঞেস করলাম ঃ মফতুন সাহেব, আপনি কি কোন দোকান খুলছেন ?

শিখদের বিশিষ্ট ভঙ্গির মত মাথা ঝাঁকিয়ে মফতুন সাহেব খুব হাসলেন ঃ না মাস্টো সাহেব, আমি এসব ক্যাটালগ আনাচ্ছি শুধু পড়বার জন্যে।

আমার বিস্ময় বাড়লো ঃ আপনি পড়বেন এই ক্যাটালগ গুলো ? তাতে লাভ কি ?

"শুধু জানবার জন্য। এভাবেই আমি অনেক কিছু জেনে থাকি।"

"আপনার সব কিছুই আলাদা দেখছি।"

"ডানলপ কোম্পানী কি তৈরি করে ?" হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলেন।

আমিও তাড়াতাড়ি জওয়াব দিলাম ঃ "টায়ার"

'টায়ার-টিউবই বানায় না— গল্‌ফ খেলার বল, রাবারের গদি, রাবার স্প্রিং, নল, হোজপাইপ আরও অনেক রকম জিনিস।'

ক্যাটালগ আসার পর তিনি সে গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়েন। তাই আমি বলি যে দেওয়ান সিং মফতুন অনেক পড়াশুনা করেন। তিনি সব ক্যাটালগ পড়েন, আর সে গুলো পড়া শেষে মহল্লার ছেলেদের দিয়ে দেন। তারাও এর ছবি দেখে আনন্দ পায়। ছেলেদের তিনি খুব ভাল বাসেন।

বিদেশী কারখানার ক্যাটালগ পড়ে তিনি তাঁর পত্রিকার জোরালো ফিচার লেখেন। "ভুলবার নয়" শিরণামের কলাম-এর মত ফিচার। প্রত্যেক প্রশ্নের জওয়াব দেন এবং প্রতি ছত্রে ভাষা ও ব্যাকরণের আদ্য শ্রাদ্ধ করেন।

হাতের লেখা খুব খারাপ। তিনি নিজে যেমন অষ্টাবক্রের মত তেমনি তাঁর কলম নিসৃত অক্ষরগুলোও আঁকা বাঁকা। আমার খুব আশ্চর্য মনে হয়, কাতিব তাঁর লেখা কি করে পড়ে ? আমি যখনই তাঁর চিঠি পেয়েছি প্রথমে অনুমানে তার অর্থ করেছি। দ্বিতীয় পালায় চেষ্টা করে দেখি প্রথমে যে অর্থ করেছিলাম,

তা একেবারে ভুল। তৃতীয় বার পড়লে অক্ষরগুলো শুদ্ধ আকার ধারণ করে। চতুর্থ বার পড়ার পর তবে গিয়ে বিষয়বস্তু স্পষ্ট বোঝা যায়।

দেওয়ান সিং মফতুন খুব সাবধানী লোক। প্রবাদ আছে, গরম দুধে মুখ পুড়লে লোকেরা ঘোলও ফু দিয়ে খায়। ইনি ঘোল ছাড়া পানিও ফু দিয়ে খান। কাতিবকে বলাই আছে তার লেখা কপি করা হলে সেগুলো যেন তখনই ফেরত দেয়া হয়। কপিগুলো শুদ্ধ করার পর তিনি লেখা কাগজগুলো টেবিলের ওপরের একটা কালো বাক্সে তালা বন্ধ করে রাখেন, আর কাগজ ছাপা হয়ে আসার পর সেগুলো নষ্ট করে ফেলেন। জানি না, এত সতর্কতা কেন?

তাঁর সমস্ত চিঠিপত্র একটা তালাবদ্ধ থলিতে আসে। তার প্রতিটি চিঠি ও কাগজ তিনি আলাদা করে রাখেন। খাম খুলে চিঠি বের করে খামটা ছিঁড়ে কাগজের ঝুড়িতে ফেলেন না, বরং চিঠির সাথে পিন-আপ করে রাখেন। এভাবে তিনি ম্যাগাজিন ও খবরের কাগজের ব্যাপারগুলোও নষ্ট করেন না। তাঁকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেনঃ সবকিছুতে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। হয়তো আমি যদি কোন পত্রিকার নামে মামলা করি। আইনতঃ যদি লাহোরের কোন কাগজ আমার বিরুদ্ধে লিখে থাকে আর আমার নাম ঠিকানা লেখা ব্যাপার না থাকে, তাহলে আমাকে লাহোরে গিয়ে মামলা করতে হবে। আর সেক্ষেত্রে যদি এখানকার ঠিকানা লেখা ব্যাপার দেখাতে পারি তাহলে প্রমাণ হবে আমাকে এখানে অর্থাৎ দিল্লীতেই অপমানিত করা হয়েছিল। যেখানে আমাকে পত্রিকা পাঠানো হয়েছে, সেখানেই আমি মামলা করতে পারি।

দেওয়ান সিং মফতুনের বিরুদ্ধে শেষ যে মামলা করা হয় (সম্ভবত বত্রিশতম) সেটা খুবই বিপজ্জনক ছিল। তিনি এবং একজন বাঙ্গালী ব্লাকমেলার জাল নোট তৈরি অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সে সময় আমি বোম্বাইতে থাকতাম। একদিন "উইকলি মুসাব্বির" এর কেয়ারে একটা টাইপ করা চিঠি পেলাম। তার ওপর কোন নাম দস্তখত নেই। টাইপ করে দেওয়ান সিং

মফতুন নাম লেখা আছে। আমাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে তাঁর মামলায় সাক্ষী দিতে।

অনেক দিনের কথা। আমি দিল্লী গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করি। অফিসে পৌঁছে দেখি, সেখানে কেউ নেই। আমি একটা চেয়ারে বসে কামরাটা দেখতে লাগলাম। খুব বড় একটা টেবিল। তার দু'দিকে দুটো রেডিও। দোয়াতদানির কাছে কুশন সল্টের দুটো বোতল, এক কোণে পর্দার আড়ালে সোফার মত একটা আসন—সম্ভবত দেওয়ান সাহেব এতে বিশ্রাম নিতেন। সব আলমারিই খোলা।

আমি এসব নিয়ে "মুসাব্বির" পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লিখি যে, যদি সেই কামরায় একটা ছোট কম্পার্টমেন্ট তৈরি করা হত, যাতে একটা কমোড থাকবে, তাহলে এটা একটা বড় রেলের কামরা হতো।

দেওয়ান সাহেব এ প্রবন্ধটা যত্ন করে রেখেছিলেম। পুলিশ যখন তাঁর অফিসে তল্লাশী চালায় তখন একটা বইয়ের মধ্যে রাখা একশ টাকার ছ'টি নোট বের করে এবং সরদার সাহেবকে গ্রেফতার করা হয়। তখন তিনি সাফাই হিসেবে আমাকে সাক্ষী মানেন।

আমার মনে হয়, সেই নিবন্ধে দিল্লীতে দেওয়ান সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাৎকারের কথাও ছিল—যা খুবই কৌতুককর।

আসল কথায় আসা যাক। বহুক্ষণ অপেক্ষার পরও যখন তিনি এলেন না, তখন আমি চলে গেলাম। সন্ধ্যায় এসে তাঁকে অফিসে পাওয়া গেল, মিচেলিন টায়ারের বিজ্ঞাপন চেয়ারে বসে আছেন। মাথায় ছোট্ট সাদাপাগড়ি। আঙ্গুলের ফাঁকে কলম ধরে কিছু লিখছিলেন। চশমার ফ্রেম উপকে বিচিত্র ভঙ্গিতে আমাকে দেখলেন এবং এমন-ভাবে লাফিয়ে উঠলেন যেন রবারের একটা বল। আমাকে খুব সাদর অভিনন্দন জানালেন। আলিঙ্গন করে বললেন, আমি জানতে পেরেছি আপনি এসেছিলেন। আমি একটা দরকারি কাজে বাইরে গিয়েছিলাম।

আমাকে বসতে বলে বোম্বের কথা জিজ্ঞেস করলেন। তার-পর একথা-সেকথা বলতে লাগলেন। আমি অনুভব করলাম যদিও তিনি আমার সাথে কথা বলছেন, কিন্তু তাঁর মনে একটা

বিরাট চিন্তা রয়েছে। কথা বলতে বলতে তিনি টেলিফোন ডায়াল করে বলতে লাগলেন, আমি সুন্দরলাল বলছি, নয়াদিল্লী থেকে লালা, ... আছেন? কোথায় গেছেন? আচ্ছা।

তাঁর অফিস ছিল পুরনো দিল্লীতে। আর একথাও সত্যি যে সুন্দর লাল নয়, তিনি দেওয়ান সিং মফতুন। এভাবে তিনি আরও কয়েকটি টেলিফোন করে একই ভাবে লালা .....এর খোঁজ নিলেন যে, তিনি কোথায়? জানিনা এই ছলনার মানে কি? কিন্তু এটা বুঝতে পারলাম, সেই লালার কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে।

টেলিফোনে যখন কোন কাজ হল না তখন তিনি আমাকে বিয়ারের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর নির্দিষ্ট লোক (সম্ভবত সরদার দয়ারাম সিং) কে ডেকে তার কানে কানে কিছু বলে তাকে বিদায় করলেন। পরে আমার দিকে ফিরে বললেনঃ তাহলে মান্টো সাহেব, আপনার জন্য বিয়ার আনাবো?

আমার বিরক্তি ধরেছিল। বললামঃ সরদার সাহেব, ফাঁকা লৌকিকতা তো আপনি দিল্লীওয়ালাদের কাছ থেকে বেশ শিখেছেন দেখছি। আনাবেন তো এত জিজ্ঞেস করার কি আছে?

একথায় দেওয়ান সাহেব খানিক হাসলেন এবং ইউপিওয়ালাদের নিয়ে সমালোচনা করতে লাগলেন। এসব লোকদের তিনি মোটেও দেখতে পারেন না। তাই যখনই তাঁর অফিসে কোন লোকের দরকার হয় তখনই তিনি বিজ্ঞাপনে একথা সংযোজন করেন যে, 'শুধু পাঞ্জাবীরাই দরখাস্ত করবেন।" কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, তিনি ইউপির এহসান ভাইয়াকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু মনে করতেন।

একবার দেওয়ান সাহেবের গাড়ী একটা সরু গলিপথ দিয়ে যাচ্ছিল। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। গলিতে ঢুকতেই দেখা গেল গলির মাঝখানে কয়েকটি খাটিয়া বিছানো রয়েছে। দেওয়ান সাহেব রেগে উঠলেন। দিল্লীওয়ালাদের সাত পুরুষের খিস্তি শুরু করলেন। কমবখ্ত তোমাদের পূর্বপুরুষ বাপদাদা সবাই দিনরাত চার পেয়েতে পথের ওপর শুয়ে শুয়ে নিজেদের রাজ্যের ভরাডুবি করেছে, খোদা তোমদের নিপাত করুক।

একটা ছেলে খাটিয়া সরাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সে সরাতে পারল না। দেওয়ান সাহেব গাড়ী থেকে নেমে খাটিয়া সরালেন। তারপর বললেন ঃ বাবাজীবন, তুমি সরাতে পারছ না। তোমার কোমরটা দেখছ না। তোমার আব্বাজান তো তোমার চেয়েও দুর্বল হবেন নিশ্চয়ই। তিনি তো পায়খানার বদনাটাও তুলতে পারবেন না।

ইতিমধ্যে অনেক লোক জমা হল। তারা দিল্লীর বৈশিষ্ট পূর্ণ ভাষায় বকতে শুরু করল। কিন্তু দেওয়ান সাহেব নির্বিকার গাড়ীতে বসে নিশ্চিন্তে চালাতে শুরু করলেন।

সরদার সাহেব পাঞ্জাবীদের খুব পছন্দ করেন। তার কারণ হয়তো অনেকদিন ধরে দিল্লীতে আছেন বলে। নয়তো শুধু পাঞ্জবীরাই যে ভালো মানুষ এমন নয়। তিনি বুকে হাত দিয়ে একথা বলতে পারবেন না যে, নিজের অফিসে পাঞ্জাবী চাকর রেখে তিনি সুবিধা পাচ্ছেন। আমি জানি, পাঞ্জাবীরা তাঁর যত ক্ষতি করেছে, তার দশ ভাগের এক ভাগও ইউপিওয়ালারা করেনি।

এবারে আমি তাঁর শেষ এবং বিপদজনক মোকদ্দমার কথায় ফিরে আসি। আমি দিল্লী গেলাম। সরদার সাহেব জামানতে ছিলেন। জানতে পারলাম তাঁকে জব্দ করবার জন্য এ মামলা দিল্লী থেকে দূরে গুড়গাঁও-এর আদালতে দায়ের করা হয়েছে। আমরা গাড়ীতে চড়ে সেখানে গেলাম। উকিল আমাকে বুঝিয়ে দিল, আমাকে কি বলতে হবে। সুতরাং দশ মিনিটেই আমার সাক্ষ্য শেষ হয়ে গেল।

সরদার সাহেব লিখিত বক্তব্য পেশ করলেন। হাজতে থাকা-কালীন তিনি সেটা তৈরী করেছিলেন। সেটা টাইপ করার পর প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠার মত হল। আমার মনে ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক এমিলি জোলার প্রবন্ধ Acuse-এর কথা উদয় হল।

দেওয়ান সিং মফতুনের এই লিখিত বক্তব্য একজন আসামীর বিবৃতি ছিল না। বরং এটা ছিল একটা অভিযোগ—যা বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল। শেষ ভাগে তাঁর সুদীর্ঘ তালিকা। ছক কেটে দেখানো হয়েছে, কোন মোকদ্দমা কে কবে, কোথায় কি অভিযোগে, কোন আদালতে চলেছে, এবং তার ফল কি হয়েছে।

সম্ভবতঃ সেটা বত্রিশতম মোকদ্দমা ছিল। এর মধ্যে একত্রিশটি তিনি সসম্মানে জিতেছিলেন। শুধু এক মোকদ্দমা—সেটা খুব রড় আর বিখ্যাত মোকদ্দমা—(ভূপালের নওয়াব দায়ের করেন), এই মোকদ্দমায় দেওয়ান সাহেবের হাজতে বাসকালীন সময়টুকু শাস্তি বলে গণ্য হয়েছিল।

সরদার সাহেব সেই মোকদ্দমায় জজের এই মন্তব্য ও উদ্ধৃত করেন ঃ আমি সরদার দেওয়ান সিং মফতুন, দিল্লীর সাপ্তাহিক 'রিয়াসতের' সম্পাদকের সাহসের প্রশংসা করছি। যিনি তাঁর সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে একজন দেশীয় রাজার সাথে লড়ে চলেছেন।

ভূপালের নওয়াবের সাথে দেওয়ান সিং মফতুন সত্যি অত্যন্ত সাহসের সাথে মোকদ্দমা করেন। কিন্তু এতে তিনি দেউলিয়া হয়ে যান। যা কিছু সঞ্চয় ছিল, সব পানির মত খরচ হয়ে যায়। আর কেউ হলে চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে যেত। কিন্তু মফতুন সাহস হারাননি। যেমনি করেই হোক তিনি তাঁর পত্রিকা প্রকাশ করতে লাগলেন।

তিনি অনেক বড় বড় লোকের সাথে বিবাদ করেছেন এবং জয়ী হয়েছেন। কিন্তু জীবনে একজনের কাছে হেরেছেন। কে তিনি? তিনি খাজা হাসান নিজামী।

সরদার সাহেব একদিন আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন ঃ মান্টো সাহেব, আমি কত বড় বড় কুতুব মিনার ফেলে দিলাম, কিন্তু এই কম বখ্‌ত হাসান নিজামীকে নোয়াতে পারলাম না। আমি তার বিরুদ্ধে এত লিখেছি যে, রিয়াসতের সেই সব কপি যদি তার মাথায় চাপিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তার চাপেই সে ভর্তা হয়ে যাবে। আরও উল্টো আমারই ভার্তা হতে হচ্ছে। আমি তার বিরুদ্ধে এত বেশি এজন্য লিখেছি যে, সে যাতে বিরক্ত হয়ে আইনের আশ্রয় নেয়। আদালতে আমি তার সব কথা ফাঁস করে দেব। কিন্তু লোকটা দারুণ ধূর্ত। সে আমাকে তেমন কোন সুযোগই দিল না—আর দেবেওনা কোনদিন।

এটা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এক সময়ে দেওয়ান সিং মফতুন ও হাসান নিজামীর মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। জানি না, পরে কেন এদের সাপে নেউলে অবস্থা হলো।

আমি আবার মামলার কথায় আসি। গুড়গাঁও-এর আদালত তাঁকে সম্ভবত দুই দফায় বার বার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়। তবে তিনি বলেছিলেন যে, চিন্তার কোন কারণ নেই, হাইকোর্টে খালাস হয়ে যাবো। শেষে হলোও তাই।

হাইকোর্ট তাঁকে সসম্মানে মুক্তিদান করেন। সরদার সাহেব আমাকে গুড়গাঁও-এ বলেছিলেন, তিনি কিছুদিন আগে শিমলা গিয়েছিলেন। সেখানকার এক পার্টিতে যোগ দেন। সে পার্টিতে স্যার ডগলাস ইয়ং ও (তদানীন্তন চীফ জাস্টিস) ছিলেন। সরদার সাহেব এক সময় তাঁর বিরুদ্ধেও অনেক কিছু লিখেছিলেন। সেই পার্টিতে স্যার ইয়ং সরদার সাহেবের সাথে দেখা করতে চান, শুনে তিনি বিস্মিত হন। চীফ জাস্টিস তাঁর জোরালো কলমের প্রশংসা করে বলেন ঃ আমি আপনার মত লোকদের বন্ধু। যদি কোন দিন কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে বিশ্বাস করুন, আমি আপনার সাহায্য করব।

আমার যতদূর মনে হয়, স্যার ডগল্যাস ইয়ং-এর এই প্রতি-শ্রুতি দেওয়ান সিং মফতুনের মুক্তিতে সহায়ক হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে মোকদ্দমা চলে। দেওয়ান সাহেব জেলে ছিলেন। এ মোকদ্দমার বক্তব্য খুব কৌতূহলোদ্দীপক ছিল। অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে বলা হয় দেওয়ান সিং কয়েকটি জাল নোট চালা-বার জন্য একটা খামে ভরে তাঁর বন্ধু জীবন লাল মট্টুকে লাহোরে পাঠান। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। খামের মধ্যে টাইপ করা একটা চিঠিও ছিল। আদালতে সেটা পেশ করা হয়েছিল।

মফতুনের টাইপ মেশিনের 'ও' এবং 'বি' টাইপ দুটো অধিক অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল অর্থাৎ অক্ষর দুটোর পেট মোটা ছিল। হাইকোর্টে যখন সেই টাইপ রাইটারের টাইপ করা কাগজ প্রমাণের জন্য পেশ করা হল তখন দেখা গেল 'ও' এবং 'বি' র পেট পরিষ্কার রয়েছে। তারপর যখন সাফাই-এর পক্ষ থেকে সওয়াল জওয়াব করা হল, যে খামটা দেওয়ান সিং মফতুন জীবন লাল মট্টুর কাছে লাহোরে পাঠিয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে তাতে দিল্লীর ডাকঘরের ছাপ ছিল ১১ই জানুয়ারীর আর লাহোর ডাকঘরের ছাপে জানা যায় এটা পনের জানুয়ারী

ডেলিভারি হয়েছে। এগার তারিখের চিঠি বেশি হলেও তেরো তারিখে পৌঁছার কথা। (তারিখ গুলো আমার সঠিক মনে নেই) তিন দিন যাবৎ তাহলে এই চিঠিটা কোথায় পড়েছিল ?

এ প্রশ্ন তুলতেই অভিযোগকারীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। তারা এর সঠিক জওয়াব দিতে পারল না। এই পয়েন্টেই আসামীর সন্দেহ করার যথেষ্ট কারন ছিল। অতএব খবরের কাগজে দেখলাম, রিয়াসত সম্পাদক সরদার দেওয়ান সিং মফতুন নোট জাল করার অভিযোগ হতে খালাস পেয়েছেন।

পরদিন সকাল আটটার দিকে নিকল্‌স্ রোডের হাসান বিল্ডিংস-এর (আমার বাসা) দরজার কড়া নড়ে উঠতেই আমার স্ত্রী দরজা খুললেন। ফিরে এসে বললেন ঃ দেওয়ান সাহেব এসেছেন। আমি দৌড়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালাম। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ ঘুট্ ঘুট্ জফিয়াঁ পাইঁ। (পাঞ্জাবীদের অভিনন্দন জানানোর পদ্ধতি)।

আমি তাঁকে মুবারকবাদ জানাবার আগেই তিনি বললেন ঃ সুবহান আল্লাহ্, বেশ মজা লেগেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কি ব্যাপারে ?

তিনি বললেন ঃ আমি জেলে আপনার 'মান্টো কে আফ্‌সানে' পড়েছি। আখবার-ই-দীন দুনিয়াতে আমাকে বেশি করে গালি গালাজ করা হয়। আজই আমি দিল্লী এসেছি। তাই ভাবলাম, সবার আগে মান্টো সাহেবের সাথে দেখা করে আসি।

আমি বুঝতে পারলাম গল্প পড়ার প্রতিও তাঁর প্রচুর আগ্রহ আছে।

টাইপ রাইটারের 'ও' আর 'বি' কি করে দুরকম হল, আর এগার তারিখের চিঠি পনের তারিখে কি করে লাহোর গেল, এটা এমন একটা গুপ্ত রহস্য যা চিরদিন গোপনই রয়ে গেল। আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি এড়িয়ে যেতেন, আর বলতেন, মান্টো সাহেব, এটা হাত সাফাই এর ব্যাপার।

দেওয়ান সাহেব আমাকে ভাল বাসতেন। মওলানা চেরাগ হাসান হাসরতকেও তিনি শ্রদ্ধা করতেন। আমরা দু'জনই দিল্লীতে ছিলাম। অবসর পেলেই তিনি খুঁজে আমাদের বের করে নিয়ে যেতেন শহর থেকে অনেক দূরে। সেখানে বসে আমরা গান করতাম, গল্প

করতাম তারপর তিনি আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যেতেন। এ ধরনের বৈঠকে কখনও কোন রাজনৈতিক বা সাহিত্য আলোচনা হতো না।

একটা মজার ঘটনা শুনুন। নিদারুণ অর্থ কষ্টের দিনে তাঁর এক বন্ধু এসে পড়লো। প্রথমে তো তিনি খুব অস্থির হয়ে পড়লেন পকেটে তো একটা পয়সাও নেই। কিন্তু তখনই এক কৌশল খেলে গেল মাথায়। বারটা লেমনেড-এর বোতল আনালেন। দুটো বন্ধুকে খাওয়ালেন, দুটো নিজে খেলেন। আটটা বাথরুমে নিয়ে ঢেলে খালি করে চাকরকে বললেন ঃ যাও এই বোতলগুলো বাজারে বিক্রি করে টাকা নিয়ে আস। যুদ্ধের সময় বোতল ভাল দামে বিক্রি হল। সুতরাং বন্ধুর রাত্রির খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

এক সময়ে তিনি অল ইণ্ডিয়া রেডিওর জানের দুশমন হয়ে পড়লেন। প্রত্যেকটি প্রোগ্রামই শুনতেন। একটা রেজিস্টার বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল রেডিওর কোন অফিসারের সাথে কোন শিল্পীর গোপনে খাতির রয়েছে।

যদি কোন শিল্পী কোন কারণে প্রোগ্রাম করতে অক্ষম হতেন এবং তদস্থলে অপর কোন শিল্পীকে গাওয়ানো হতো, তিনি বুঝতে পারতেন, এটা কোন কর্তার অনুগ্রহের ফল।

বহুদিন ধরে তিনি জুলফিকার আহমদ বোখারীর বিরুদ্ধে লিখতেন। পরবর্তীকালে যুগল কিশোর (পরে আহমদ সুলায়মান, ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল, রেডিও পাকিস্তান) এর ওপর হামলা চালান। যুগল কিশোর প্রথমে কলকাতায় ছিলেন। বদলি হয়ে দিল্লী আসার পর সেখানকার এক বাঙালী মহিলা তাঁকে প্রেমপত্র লিখতেন। যুগল কিশোর বিস্ময় মানতেন যে, এ সব চিঠি আমার কাছে না এসে মফতুনের কাছে কি করে যায়? এটাও সম্ভবত হাত সাফাই ছিল। যাই হোক আমি অনেক চেষ্টার পর যুগল কিশোরের বিপন্মুক্তি করাই এবং তাঁকে বলি যে সেই বাঙালী মহিলার চিঠিগুলো দিয়ে দিন। তিনি হেসে বললেন ঃ আমি অত বোকা নই। আপনার বন্ধু যদি এ চিঠিগুলো পড়তে চায় তো আমি সেগুলো নকল করিয়ে পাঠিয়ে দেব।

আমি আর বেশি জোর দিলাম না।

দিল্লীতে অমৃতসরের একটা লোক একদিন হন্ত দন্ত হয়ে আমার কাছে এল। তার ছোট ভাই একটা মেয়েকে ভাগিয়ে দিল্লীতে এনেছে। তার গ্রেফতারির ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। সে এটা মিটাবার জন্য আমার সাহায্য চাচ্ছে। আমি তাকে দেওয়ান সাহেবের কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি সমস্ত ব্যাপার শুনে বললেন ঃ অপহরণকারী ও অপহৃতাকে আমার কাছে নিয়ে এস।

পরদিন দেওয়ান সাহেবের সাথে দেখা হলে তিনি জানালেন ওরা এসেছিল। আমি সব ঠিক করে দিয়েছি। সব ঠিক করে দিয়েছেন নিশ্চয়ই, নতুবা সে লোকটি আমার কাছে আবারও আসতো।

দেওয়ান সিং-এর তথ্য সংগ্রহের উৎস ছিল বিস্তীর্ণ। পাকিস্তানের কোন ফেরেস্তাও জানত না যে, কায়েদে আজম জিয়ারতে গিয়ে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু রিয়াসত পত্রিকায় এ সম্পর্কে একটা শোকাবহ প্রবন্ধ দু'সপ্তাহ আগেই ছাপা হয়েছিল। তাতে দেওয়ান সিং মফতুন তাঁর বিশেষ ভঙ্গিতে লিখেছিলেন ঃ কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এখন মৃত্যুশয্যায়, কিন্তু আমি দোয়া করি, তিনি জীবিত থাকুন, আর পাকিস্তানকে···।

লোকে তাকে ব্লাক-মেলার, প্রতারক, চোর, বাটপাড় বলে। কিন্তু তাঁর বক্ষে মানব প্রেমের একটা অন্তর আছে। গত দাঙ্গার সময় তিনি হিংস্র শিখ ও হিন্দুদের যত নারী পুরুষ ও শিশুকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এজন্য তাদের অন্তর থেকে যে দোয়া বেরিয়েছিল, তাই তাঁর সমস্ত গুনাহ মাফের জন্য যথেষ্ট ছিল।

কিছুদিন আগে আমি অসুস্থ ছিলাম। মেয়ো হাসপাতালের 'এ' ওয়ার্ডে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলাম। আমার স্ত্রী ও ভগ্নী পরে আমাকে জানাল আমি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বার বার দেওয়ান সিং মফতুনকে স্মরণ করেছি। আমি মনে করেছিলাম আমি দিল্লীতেই আছি। একটু দূরেই 'রিয়াসত'-এর অফিস। সেখানে ফোন করা যায়। আমি তাঁদের বলেছি যাও শীগ্‌গীর, টেলিফোন কর, সরদার সাহেবকে বলো মান্টো ডাকছে আপনাকে। খুব জরুরি কাজ আছে।

তাঁরা বোঝাতেন তুমি লাহোরে আছ, কিন্তু আমি মানতাম না।

যদিও তখন আমি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিলাম—হাঁ বা না-এর মধ্যে দোদুল্য মান—আমার মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন। কিন্তু আমার বেশ মনে পড়ছিল যেখানে আমার শয্যা ছিল তার থেকে একটু দূরে একটা দরজা—দরজার ওপাশেই একটা বড় হল। সেখানে দুটো ইংরেজ বালক পিং পং খেলছে। সেটা অতিক্রম করলেই ল্পাজা সিনেমার (দিল্লী) গেট—কিন্তু দুঃখের বিষয়, দরজাটা সব সময় বন্ধ থাকে। সে জন্য তাদের বারবার অনুরোধ করতাম, তারা যেন সরদার দেওয়ান সিংকে ফোন করে—তবে আমার কি দরকারি কাজ ছিল, তা মনে পড়ে না। এটা পরামাশ্চর্য যে, আমার প্রায় বিস্মৃত মস্তিষ্কে একমাত্র দেওয়ান সিং মফতুনের কথা স্মরণ হল কি করে?

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

সঙ্গীত পরিচালক রফিক গজনভী

আমি যখন রফিক গজনবীর কথা মনে করি, কেন জানি হঠাৎ আমার মাহমুদ গজনবীর কথা মনে পড়ে যায়। গজনভী সতের বার হিন্দুস্তান আক্রমণ করেন এবং বার বার জয়লাভ করেন। মাহমুদ গজনভী ও রফিক গজনভীর মধ্যে এতটা সাদৃশ্য অবশ্য আছে যে, উভয়েই 'বুৎ শিকন'—অর্থাৎ প্রতিমা চূর্ণকারী (উর্দুতে প্রেমিকাকেও বুৎ বলা হয়)। রফিক গজনভীর সামনে এমন কোন সোমনাথ ছিল না—যা ভেঙে ফেলে তার মধ্যকার ধনরত্ন লুঠ করবে, তবুও তার জীবনে বেশ কয়েকজন জীবন্ত প্রতিমার উদ্ভব হয়েছিল, (সংখ্যা প্রায় বার হবে) যারা তার রক্ষিতা ছিল।

রফিক গজনবীর নাম শুনলে মনে হবে তার পিতৃপুরুষ হয়তো গজনীর অধিবাসী। আমি জানি না সে গজনী দেখেছে কি না। শুধু এটুকু জানা যায়, সে পেশওয়ারে থাকতো। সে পুশতু বলতে পারে। আফগানি ফারসীও জানে। তবে সে পাঞ্জাবীতেই কথা বলতো, ইংরেজিও বেশ ভাল লেখে—আর যদি সে উর্দু প্রবন্ধ রচনা করত, তাহলে সে লেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ করতে পারতো।

উর্দু সাহিত্যে তার অপরিসীম দখল ছিল। তার কাছে উর্দু সাহিত্যের অনেক বই আছে। আমি প্রথম যখন তার বোম্বের বাসা 'গুলশান মহলে' যাই দেখলাম অনেক বই সাজিয়ে রেখেছে। আমার ধারণা ছিল, সে একজন মিরাসি (সঙ্গীত জীবী) তার সাহিত্য সম্বন্ধে জানা শোনা নেই। কিন্তু তার সাথে আলাপের পর এমন সব লেখকের নাম শুনলাম, যার সাথে আমি মোটেই

পরিচিত নই। সে আমাকে জানাল, আবুল ফজল সিদ্দিকী নামে একজন লেখক আছেন, যিনি পশু পাখী সম্পর্কে লিখে থাকেন। মূলতঃ তারপর থেকে আমি তাঁর গল্প পড়ে আনন্দ পাই।

আমি বুঝতে পারছিনা রফিক গজনবী সম্বন্ধে এই যে প্রবন্ধ লিখছি, এটা কোথা থেকে শুরু করব। কিন্তু আমি মনে করি, এটা শুরু হয়ে গেছ এবং ভালোয় ভালোয় শেষও হয়ে যাবে।

এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, তার সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয়ের আগে থেকেই তাকে আমি জানতাম। কি করে জানতাম, কবে থেকে জানতাম, তা মনে নেই। এখন থেকে প্রায় চব্বিশ পঁচিশ বছর আগেরকথা। আমি অমৃতসরের বিজলীওয়ালা চক দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় এক পানওয়ালা আমাকে ডেকে বলল ঃ বাবু সাহেব, অনেক দিন হয়ে গেল, এবার হিসাবটা মিটিয়ে দিন।

আমি শুনে বিস্মিত হলাম। কেননা আমি এ দোকানে কোন কেনাকাটা কখনও করিনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিসের হিসাব ? আমি তো আজই প্রথম তোমার দোকানে এলাম।

এ কথায় পানওয়ালা একটু হাসল। বলল, না দেয়ার হলে লোকে এমনিই বলে থাকে।

আমি তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করায় বলল, সে আমাকে রফিক গজনভী মনে করেছে— রফিক গজনভী তার কাছ থেকে ধারে সওদা নিত। আমি বললাম, আমি রফিক নই আমার নাম সাআদত হাসান মান্টো, তখন সে বলল, আমার চেহারার সাথে রফিকের চেহারার বেশ সাদৃশ আছে।

রফিক গজনভীর নাম আমি তারও আগে শুনেছি। কিন্তু তার সাথে দেখা করবার কোন আগ্রহ আমার ছিলনা কোন দিন। তবে যখন শুনলাম তার চেহারার সাথে আমার মিল আছে তখন তাকে দেখবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ জাগল।

এটা সেই সময়ের কথা—যখন আমি ভবঘুরেপনা শুরু করেছি। মন সর্বদা চঞ্চল থাকতো, এক বিচিত্র অনুভূতি মস্তিষ্ক কুরে কুরে খেত। মনে হত, যা সামনে পাই-তাই একবার ছুঁয়ে দেখি। তা সে যত তিক্ত বা বিস্বাদই হোক না কেন!

আস্তানায় যেতাম, কবরস্তানে ঘোরাঘুরি করতাম। জালিয়ানওয়ালাবাগের কোন গাছের ছায়ায় ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে এমন সব বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতাম, যাতে মুহূর্তে ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া যায়। স্কুলগামী ছাত্রীদের দিকে চেয়ে দেখা এবং তাদের মধ্যে সবচে' যে সুন্দরী—তার সাথে প্রেম করার পরিকল্পনাও করতাম। বোমা তৈরির ফর্মূলা লাভের চেষ্টা করতাম। বড় বড় গায়কদের গান শুনতাম আর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বুঝবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করতাম।

সেকালে আমি ছিটেফোটা কবিতা লেখবার চেষ্টাও করি, অলীক প্রেমিকার উদ্দেশ্যে সুগন্ধি কাগজে বড় বড় প্রেমপত্রও লিখেছি—পরে এসব পাগালামো মনে করে ছিঁড়ে ফেলেছি। বন্ধুদের সাথে মিলে চরস-সিগ্রেট কোকেন খেয়েছি। মদও খেয়েছি, কিন্তু এত করেও মানসিক অস্থিরতা দূর হয়নি।

এই সময়েই আমার রফিক গজনভীর সাথে দেখা করবার ইচ্ছা জাগল। সুতরাং বিভিন্ন আড্ডায় মদের দোকানে আর নিষিদ্ধ এলাকায় গিয়ে গিয়ে খোঁজ নিতে শুরু করলাম সেখানে রফিক গজনভী বলে কেউ আছে কিনা—কিন্তু কেউ তার ঠিকানা বলতে পারল না। কয়েকবার শুনলাম সে অমৃতসরেও এসেছে কিন্তু আমি তাকে অনেক খুঁজেও দেখা পাইনি।

একদিন শুনলাম সে তার কোন বন্ধুর বাসায় এসে উঠেছে। তার এই বন্ধু একজন দরজি। আমি তার নাম ভুলে গিয়েছি। তার বৈঠকখানা ছিল আমাদের ঘরের পাশে করমু দেউড়ির এক গলিতে—সেখানেই সে সেলাই করত। আমি সেখানে গিয়ে রফিকের খোঁজ করলাম। শুনলাম সে শহরের বাইরে নির্জন এলাকায় দরজির গ্রামের বাড়ীতে আছে। আমার বন্ধু বালে এ খবরটা দিল। সেও সেখানে যাচ্ছিল, আমিও সেই সুযোগে সেখানে গেলাম।

এখানে বালের পরিচয়টা দেয়া আবশ্যক মনে করছি। একথা বলতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে যে, লোকে তাকে বালা কুঁজড়া বলে ডাকে। জানিনা, লোকে কেন মানুষের নামের সাথে তার পিতৃপিতামহের হীন পেশার কথা মনে করে সেই সম্পর্ক ধরে ডাকে। বালাকে আমি জানি, সে একজন শিক্ষিত তরুণ, রুচিবান,

হাসিখুশী ও কাব্যমনা। তার চরিত্রে যে গুণাবলী ছিল তা মানুষকে শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে দিতে পারে।

লোকে নীচ বংশোদ্ভূত বলে চিহ্নিত করার জন্যই তাকে ঐ নামে ডাকে। কিন্তু সে তা গ্রাহ্য করতোনা। এখন সে করাচীতে থাকে এবং তার শিল্পকর্ম করে। কিছুদিন আগে আমি খবরের কাগজে দেখলাম সে একজন খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তার শিল্প কর্ম বহু সমজদারের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

বালা গান করতেও জানত। তবে তার গলা ছিল হেঁড়ে। ক্যাপ্টেন ওয়াহিদ, আনোয়ার পেইন্টার, আশেক ফটোগ্রাফার, কবি ফকির হোসেন সলিল, গিয়ানি সিং ডেন্টিস্ট—এদের একটা বোহে মিয়ান দল ছিল। প্রায় সময়ই তারা আনোয়ার পেইন্টার বা গিয়ানি সিং-এর দোকানে আড্ডা দিত। তাছাড়া তারা জিজের (আজিজের) হোটেল শিরাজে বা সেই দরজি—যার নাম ভুলে গেছি তার দোকানেও আড্ডা দিত।

গোশত রান্না হত, আর তার সাথে থাকতো তবলার চাঁটির সাথে রাগরাগিনী আর ঠুমরি দাদরার আলাপ। আশেক আলী ফটো গ্রাফার-এর গলা খুব মিষ্টি ছিল, কিন্তু খুব মিহিন সুরে গাইত। সে সব সময় রফিকের ঢঙ্গে গান গাইত। ক্যাপটেন ওয়াহিদ তবলা বাজাতো। আর আনোয়ার পেইন্টার শুধু বাহবা দিত। গিয়ানি সিং দাঁত তোলা ভুলে খান সাহেব আশেক আলী খানের (ক্যাপ্টন ফতেহ আলী খানের সন্তান) গম্ভীর সুরে হেঁড়ে গলায় পাহাড়ি শুনাতো। আর বালা শুধু ব্যঙ্গ কৌতুক—আর কখনও তার নিজস্ব রচনা গজলও শুনাতো। তার গজলও মন্দ ছিলনা। গিয়ানি সিং-এর বেশ ভাল কারবার ছিল। কিন্তু যার শিল্পপ্রীতি চাড়া দিয়ে ওঠে তার কথা আলাদা। এই জগতে সে এমন ডুবে গেল যে তার দাঁত তোলার দোকান সাজ সরঞ্জাম সহ গায়েব হয়ে গেল। আনোয়ার পেইন্টারও দেউলিয়া হয়ে গেল।

আশেক আলী ফটোগ্রাফারের অবস্থাও তাই দাঁড়াল। সে অমৃতসর থেকে সেই যে হাওয়া হল, আদ্যাবধি তার কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি। আজ জিজের (আজিজ) নাম নিশানও নেই। এখন সে লাহোরে ডিস্‌পেনসারি খুলেছে—আর কবি রফিক হোসেন সলিল সাবান তৈরি করছে।

গেয়ানি সিং একজন সফল অভিনেতা হয়েছিল। কিন্তু এখন শোনা যায়, সে সংসার ছেড়ে বৈরাগ্য নিয়েছে। ক্যাপটেন ওয়াহিদ পাঁচ সন্তানের মাকে বিয়ে করেছে—সে আজকাল ঠিকেদারী করে। আর রফিক গজনভী আগেও যে রঙে থাকতো—এখনও তেমনি আছে। করাচীতে রেসের ঘোড়া দৌড়ায় আর ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করে।

এটা বড়ই বিরক্তিকর ব্যাপার, যখনই আমি এসব বিষয়ে লিখতে কলম ধরি তখন প্রায়ই বিষয়ান্তরে চলে যাই। দেখুন না, কথা বলছিলাম রফিক গজনভী সম্পর্কে—তা ছেড়ে চলে গেলাম ডালে ডালে।

আচ্ছা, তো আমি বালার সাথে চলছিলাম। এপ্রিলের অন্ধকার রাত। টাঙ্গা বহুক্ষণ চলতে লাগল। অবশেষে বালা একটা প্রায়ান্ধকার বাড়ীতে টাঙ্গা থামাল। চব্বিশ বছর আগের কথা। তবু আমার মনে আছে একতলা বাড়িটায় ঢুকলাম—সেটার চারপাশে গাছপালা ঘেরা ছিল। ভেতরে লণ্ঠন জ্বলছিল। মেধা মটকু আর সেই দরজি—যার নাম ভুলে গিয়েছি—এরা দুজন মদ খাচ্ছে আর ফ্লাশ খেলছে।

মেধা মটকুকে আমি দারুণ ঘৃণা করি। প্রথমত লোকটা যেমন মোটা তেমনি শক্তিমান। দ্বিতীয়তঃ সে জবর দস্তি আমাকে ফ্লাশ খেলতে বাধ্য করে। তারপর চালাকি করে তাসের হেরফের দেখিয়ে আমাকে দশ-পনের টাকা দেনা করে ফেলে। একদিন পরই বাজারে বা গলিপথে দেখা হতেই সে তার ভয়ানক চাকুটা দেখিয়ে আমার কাছ থেকে পাওয়ানা টাকাটা আদায় করে নিতো।

বালা দর্জিকে রফিকের কথা জিজ্ঞেস করে জবাব পেল দু'দিন থেকে রফিক গায়েব হয়ে আছে। কোথায় গেছে বা আছে সে কথা জানা নেই। দরজি বলল, তুমি তো জান বালা, সে কোন বাইজির ঘরে ঢুকলে পনের দিনের কমে আর বেরোবার নাম করে না।

আমার এ প্রয়াসও ব্যর্থ হল। সম্ভবত এক বছর পরে আমি আশেক আলী ফটোগ্রাফারের ডার্করুমের একটা ডিশে রফিরের ছবি ভাসতে দেখি। আশেক আলী খুব ভালো ফটোগ্রাফার। সম্ভবত সে-ই এ শিল্পে প্রথম—যে ফটোগ্রাফীর পুরনো নিয়ম কানুন ভঙ্গ করেছে।

সাধারণত ফটোগ্রাফাররা তাদের গ্রাহকদের খুশী করার জন্য চেহারার কুঞ্চন ও বলিরেখা গুলো মিটিয়ে দেয়, যাতে তার ব্যক্তিত্ব সুন্দর ভাবে বিকাশ লাভ করে। খদ্দেরের মুখটা খোসা ছড়ানো আলুর মত মোলায়েম করে দেয়। কিন্তু আশেক আলী বলত ফটোগ্রাফারের কাজ হল, সে মানুষকে যে ভাবে দেখবে সেই ভাবেই পেশ করবে। ক্যামেরার কাজ তো শুধু সঠিক প্রতিচ্ছবি নেয়া।

আশেক আলী আলোছায়ার প্রতিফলন ঘটাতে বেশ দক্ষ ছিল। রফিকের যে ছবি আমি দেখলাম, সেটা বোধহয় তার একটা মাস্টারপীস। রফিকের পরনে আরবী পোশাক—তার দীর্ঘ দেহ বেশ আকর্ষনীয়। ছবিটায় ছায়া বেশি ছিল, আর আলো ছিল কম। মুখাকৃতি ভীষণ তীক্ষ্ণ কিন্তু চিত্তাকর্ষক। সুন্দর দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী—দীর্ঘ নাসা অগ্রভাগ ফনার মত। ঠোঁটচাপা দুপাশে ত্রিভুজ। চুল ব্যাকব্রাশ করা। জুলফি লম্বা। তাতে আর আমাতে কোন সাদৃশ্য দেখতে পেলাম না। জানি না, পানওয়ালা আমকে কি করে রফিক বলে ভুল করল।

আশেক আলী আমাকে বলল, রফিক পরশুদিন এসেছিল এবং সেদিনই সন্ধ্যায় লাহোরে চলে গেছে। আমি লাহোরে গেলাম—শুনলাম সে রাওয়ালপিণ্ডি গেছে। অষ্টম দিনে জানতে পারলাম, সে অমৃত সরেরই এক পতিতার ঘরে আছে। শুনে আমার মেজাজ বিগড়ে গেল।

এরপর আরও কয়েক বছর কেটে গেছে রফিকের সঙ্গে দেখা হওয়ার কোন উপায় খুঁজে পেলাম না। আমি এমনিতেও শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে তার সন্ধান ছেড়ে দিয়েছিলাম।

রফিকের নিজস্ব ঢঙে গাওয়া গজল পতিতাদের ঘরেই গীত হত। এটা কি? রফিকের ঢঙ। এ কেমন সুর? হুজুর এটা রফিক গজনভীর সুর। আর এই যে ভাঙা ঘড়িটা দেখছেন, এটাও রফিক সাহেবের। কাল যখন তান তুলে এমনি করে হাত উঁচিয়েছিলেন তখন দেয়ালের সাথে লেগে ঘড়িটা গুড়ো হয়ে গেছে। পরশুদিন রফিক এক পতিতার ঘরে গান শোনাচ্ছিল—যন্ত্রপাতির সুর বাঁধা হল। রফিক তবলাওয়ালাকে বলল, তুমিও সুরের সাথে তবলা বাঁধ। তবলচি বলল, বেঁধেছি। রফিক বলল, আবার বাঁধ,

ডানহাতে একটা মাছি বসেছিল তো! জাহান্নামে যাক মাছি আর জাহান্নামে যাক রফিক গজনভী।

সেকালে এ গজলটা সাধারণতঃ রফিকের সুরে গাওয়া হত। চেষ্টা করে দেখি স্মৃতির ওপর জোর দিয়ে তার কোন চরণ মনে করতে পারি কি না। মনে পড়ছে না—অনেকটা এরকম ছিল, সো রহে হ্যায় পাসবাঁ ইয়ার হ্যায় খাব-ই-নাজ মে।

খোদা মালুম আরও যেন কি—

না ওহ্ গজনভী কা তড়প্ রহি, না ওহ্

খম হ্যায় জুলফে আয়াজ মে।

সম্ভবত ইকবালের কোন গজল। মাফ করবেন, আমার স্মৃতি খুব দুর্বল।

এরপর জানতে পারলাম, এ আর কারদার লাহোরে প্রথম পাঞ্জাবী সবাক চিত্র "হির রাজা" তৈরি করছে আর তার হিরো হল রফিক গজনভী। হিরোইন হল অমৃতসরের এক নষ্টামেয়ে, নাম আনোয়ারী (পরবর্তী কালে রেডিও পাকিস্তানের ডেপুটি ডাইরেকটর জেনারেল জনাব আহমদ সোলেমান, সাবেক যুগল কিশোর মেহরার পত্নী) আর কীদুর পার্ট দেয়া হল এম ইসমাইলকে।

ছবি তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু আমি লাহোরে যেতে পারলাম না। জানি না কেন। এসময়ে নানা গুজব শুনতে পাওয়া গেল। কারদারের সাথে রফিকের ঝগড়া হয়ে গেছে। রফিক আনোয়ারীর সাথে প্রেম করতে শুরু করেছে। আনোয়ারীর মা তাতে দারুণ খাপ্পা। নিশ্চয়ই এক সময় খুনো খুনি হয়ে যাবে। কিন্তু একদিন খবর এল, রফিক আনোয়ারীকে নাটকীয় ভঙ্গিতে নিয়ে উড়াল দিয়েছে।

আনোয়ারীর মা অনেক চেচাঁমেচি করল। রফিকের পেছনে গুণ্ডা লেলিয়ে দিল। কিন্তু সে এসব গ্রাহ্য করল না—অবশেষে একদিন সে আনোয়ারীকে অমৃতসরে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিল; অত্যন্ত দুঃখজনক ভাষায় এই বলে যে, এই নাও সামলাও তোমার সুণ্ড কি পুত্রীকে অর্থাৎ অবৈধ ঔরস জাত কন্যাকে।

সে বেচারী আর কি সামলাবে? সুতরাং এখন তার সেই উচ্ছিষ্টা মেয়েকে শর্ত হীন ভাবে রফিকের হাতেই সমর্পণ করতে হল।

রফিক গজনভীর প্রেম ও সৌন্দর্য-সোমনাথের ওপর এটা প্রথম বিজয়। রফিকের ঔরসে আনোয়ারীর গর্ভে এক কন্যা জন্মে। (পরে সে নাসরীন নামে চিত্রাবতরণ করে এবং এ আর কারদারের 'শাহজাহান' ছবিতে রুহির ভূমিকায় অভিনয় করে। কিছুদিন আগে সাবেক যুগল কিশোর মেহরা-পরে আহমদ সলমান—রেডিও পাকিস্তানের ডেপুটি ডিরেকটর জেনারেলের কন্যা পরিচয়ে করাচীর এক ধনাঢ্য ব্যক্তির সাথে বিবাহ হয়।)

এর কিছুকাল পর আমি বোম্বে গেলাম। সেখানে অনেক দিন যাবৎ খবরের কাগজে কাজ করতে থাকলাম। এসময়ে জানতে পারলাম রফিক আনোয়ারীকে ছেড়ে দিয়েছে। সে এখন কলকাতায় গিয়ে ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করছে।

আমি তখন বেশ লিখতে শুরু করেছি, সাহিত্যিক মহলে আমার পরিচিতিও হয়েছে। উর্দু সাহিত্যানুরাগীরা আমাকে চিনতে শুরু করেছে। অনেক দিন যাবৎ খবরের কাগজে ঝকমারী করার পর আমি সিনেমা জগতে প্রবেশ করি। এখানেও বছর দুয়েক ধাক্কাবাজী করতে হলো। কাজের উন্নতি করতে করতে আমি ক্রমে হিন্দুস্তান সিনেটোনে গিয়ে পৌঁছলাম। তার মালিক ছিল নানুভাই দেশাই। তিনি কয়েকটি ফিল্ম কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। তার সবগুলোই দেউলিয়া হয়ে গেল। এবার তিনি হিন্দুস্তান সিনেটোন নামে একটা কোম্পানীর পত্তন করলেন, যার জন্মের সঙ্গেই সঙ্গেই দেউলিয়া হওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

আমি এই কোম্পনীর জন্য 'মাড' অর্থাৎ 'কাদা' নামে একটি গল্প লিখি। সেটা সকলেরই পছন্দ হল। এটা বিপ্লবী সমাজ তন্ত্রী ধ্যান ধারণা সম্পর্কিত গল্প ছিল। সেই যুগে শেঠ নানুভাই দেশাই কি করে এটা পছন্দ করলেন, ভাবতেও অবাক লাগে।

আমি সংলাপ লিখতে ব্যাস্ত ছিলাম, এমন সময় কে যেন বলল ঃ রফিক গজনভী স্টুডিওতে রয়েছে এবং তোমার সাথে দেখা করতে চায়। আমার মনে প্রথম যে প্রশ্ন উঠল, সেটা হল ; সে কি করে আমার নাম জানল। আমি চিন্তা করছিলাম, এমন সময় একজন দীর্ঘ দেহী সুপুরুশ উত্তম স্যুট পরে এসে হাজির হল সেখানে। **এই রফিক গজনভী।**

সে কামরায় ঢুকেই আমাকে একটা অশ্রাব্য গালি দিয়ে বলল ঃ তুমি এখানে লুকিয়ে রয়েছ, তখনই—ঠিক তখনই, আমার মনে হল, রফিক গজনভীকে আমি সৃষ্টির আদিকাল থেকেই জানি। সুতরাং তখনই তার সাথে এমন আলাপ জুড়ে দিলাম যেন অনেক দিন থেকেই আমাদের আলাপ।

তার কথা বার্তা চাল চলন, ভাবভঙ্গিতে একটা সামঞ্জস্য পূর্ণ নির্ভীক ভাব পরিলক্ষিত হলো। যে ছবি আমি আশেক আলী ফটোগ্রাফারের দোকানের ডার্করুমে একটা ডিশের পানিতে দেখেছিলাম, তাতে আর এই রক্ত মাংসের রফিকের পার্থক্য শুধু এই যে সেটা ছিল বোবা আর এটা সবাক। কিন্তু তার বাচন ভঙ্গি অসঙ্গতি পূর্ণ মনে হল। যদি তাঁর ঠোঁট না খুলত, খুললেও বিশ্রী দাঁত আর মাড়ি না বের হত, তাহলে আমার আপত্তির কারণ ছিল না।

শুধু তাই নয়, আমি তার কথায় প্রচুর বাজারী শব্দ লক্ষ্য করলাম। যদিও দাঁত ও মারী সহ্য করতে পারতাম—কিন্তু ঘটনা ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

তার হাত নাচানোর ভঙ্গিও আমার পছন্দ ছিলনা। আমার মনে হচ্ছিল, যার সঙ্গে সে কথা বলছে, সে যেন একটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক। এ অনুভূতি আমার জন্য মাত্রও সান্তনাদায়ক ছিল না। কারণ এটা ছিল আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকার। অবশ্য শেষাবধি আমি এসব ছোট ছোট ব্যাপার গুলো বেশি আমল দিলাম না।

রফিক যাবার সময় আমাকে বলেছিল বোম্বে সেন্ট্রাল স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে (হোটেলের নাম ভুলে গেছি) থাকে সে। সে খুবই দুরবস্থায় পড়ে কলকাতা থেকে এসেছে—আশা ছিল বোম্বেতে এসে সে যে কোন একটা কাজ পেয়ে যাবে।

আমাকে যেহেতু সে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল তাই সন্ধ্যায় আমি তার হোটেলে গেলাম। একটু খোঁজাখুঁজির পরই তার কামরা পাওয়া গেল। কামরায় ঢুকতেই দেখা গেল গালিচা বিছানো রয়েছে, তার এককোণে রেশমী কাপড়ের গেলাফে ঢাকা একটা বিচিত্র বীণা। অপর কোণে রফিকের জুতো-স্যাণ্ডেল, বেশ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তারপর একটি মেয়ে লোক—যাকে দেখে বারবনিতা

বলে ধারণা করা যায়। এ হলো জোহরা। (পরবর্তী কালের জোহরা মির্জা—মির্জা সাহেব কোন আমলে চিত্র পরিচালক ছিলেন এবং গত পনের-ষোল বছর ধরে ফিল্ম কোম্পানী খুলবার চেষ্টা করছেন।)

জোহরার সাথে দুটো সন্তান ছিল। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে—ছেলেটি ছোট আর মেয়েটি বড়, নাম পারভীন। 'শাহীনা' নামে সে ছবিতে অভিনয় করে। প্রথম ছবি 'বেলি' যার কাহিনী আমার লেখা—ছবিটি দারুন ভাবে ব্যর্থ হয়। সে সময়ে তার বয়েস ছিল পাঁচ বছর।)

দেখুন, আমি লিখতে লিখতে ঘটনা প্রবাহে এমন ভাবে বয়ে চলেছি যে, আপনাদের সেকথা বলতে বেমালুম ভুলেই গিয়েছি। আমি যখন চিত্রজগতে প্রবেশ করি, অর্থাৎ আমি যখন ইম্পিরিয়েল ফিল্ম কোম্পানীতে "মুনশী" হিসেবে চাকরি নেই, তখন সেখানে দুটো যুবতী মেয়েকে আনা হয়। এদের একজন হালকা পাতলা—অপর জন মোটা সোটা। (এরা জোহরার ছোট দুবোন, শয়দা আর হীরা।

শয়দা অসম্ভব রকমের চঞ্চল। তার সর্বাঙ্গ স্পন্দিত হতে থাকে সর্বক্ষণ। চেহারার গড়নও ভাল ছিল, কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত কথা বলত। এত দ্রুত যে একশব্দ আরেক শব্দের ওপর সওয়ার হয়ে যেত। তার সাথে কথা বলবার সময় আমার খুব কষ্ট হত। তার কাছে শুনেছিলাম ফেকু ভাইজান (রফিক গজনভী) আনোয়ারীকে ছেড়ে দিয়েছে এবং তার বড় বোন জোহরাকে বিয়ে করেছে। হীরা ছিল মোটা আর বেঢপ—তাই ফিল্মে তার জায়গা হল না। শয়দার চাকরি হল ইম্পিরিয়েলের রঙিন ছবি হিন্দ্‌মাতায়, ছবিটি ফ্লপ করে।

আমি আপনাদের একটা মজার কথা বলি। একদিন কোন প্রয়োজনে ইম্পেরিয়েল ফিল্মের মালিক শেঠ আর্দেশীর ইরানীর সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। অফিসের সুইং ডোর খুলতেই শেঠ নিশ্চিন্ত মনে একহাতে মোটরের হর্নের মতো শায়দার··· টিপছে, আমি ভ্যাবাচেকা খেয়ে উল্টো পায়ে ফিরে এলাম।

আবার আমি জোহরার মেয়ে পারভীনের কথায় আসছি। তার চোখ দুটো নীল ছিল, যেমন জরিনা উর্ফে নাসরীনের। রফিকের

চোখও নীল নয়—আনোয়ারী ও জোহরারও চোখ নীল নয়। আর এরা দু'জন যথাক্রমে জরিনাও শাহীনার মা। আসলে চোখের এই নীল রঙ মেয়েগুলো তাদের দাদীর কাছ থেকে পেয়েছিল। তার চোখ খুব বিশাল ছিল। আর রঙও ছিল গাঢ় নীল। দৈহিক দিক থেকে খুবই লম্বা চওড়া—কিন্তু চুল ছিল শনের মত।

যাক—আমি রফিকের সঙ্গে দেখা করলাম। কামরায় ঢুকে এক নজর দেখেই আমি বুঝে নিলাম সে অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় এখানে আছে এবং রোজগারের ধান্দায় লবেজান।

আমি এখানে আপনাকে রফিকের বিচিত্র ব্যাক্তিত্বের কিছু বিচিত্র স্বভাবের কথা বলি। যখন সে বোম্বের ভাষায় 'কুড়কি' অর্থাৎ নিঃসম্বল হয়ে পড়ে তখন সে খুব ভালো কাপড় জামা পরে। যেই আবার সচ্ছলতা আসে তখনই মামুলি জামা কাপড় পরে। এমনিতে সে কাপড় জামা পরবার কায়দা জানে, আর যা পরতো তাতেই মানাতো তাকে।

হোটেলের কামরায় আমি অল্পক্ষণ ছিলাম। তারপর আমরা নিচে লনে নেমে এলাম। আমরা দু'জন বহুক্ষণ যাবৎ লনে বসে বসে আলাপ করলাম। এ সময়ে একটা মজার ব্যাপার ঘটল।

আমরা ফাঁকে ফাঁকে কিছু পানও করছিলাম। এমন সময় এক মহিলার আগমন হল সেখানে, মোটা সোটা গোল গাল চেহারার। এসেই আমাদের পাশের চেয়ারে বসল। সে রফিকের দিকে পিট পিট চোখে চেয়ে একটু হাসল। রফিক তার দিকেও গ্লাস বাড়িয়ে দিল। রফিক তার পরিচয় দিল।

সে একটা ফিল্ম পাগল মেয়ে লোক। মেয়েলোক এজন্য বলছি যে, সে কৈশোরের চাঞ্চল্য অতিক্রম করে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। রফিক বলল ঃ সে শিখ সম্প্রদায়ের মহিলা এবং প্রচুর বিত্তশালিনী, বোম্বে এসেছে শুধু অশোক কুমারকে একবার দর্শন করতে। আমি রফিকের কানে মেয়েলোকটিকে উদ্দেশ্য করে বল লাম ঃ ছাড় মাগী অশোক কুমারকে। নিজের শারীরটা দেখ, তোর বুকের ওপর যদি আশোক কুমারকে বসিয়ে দেয়া যায় তাহলে মনে হবে যে কামান দাগছে বসে।

ভেংচি কাটা রফিকের একটা আনন্দদায়ক মুদ্রাদোষ, বরং এটাই যেন তার স্বভাব। আমার কথা শুনে শিখ মেয়েলোকটি তো চুপসে গেল কিন্তু রফিক হো হো করে হেসে উঠল।

তাছাড়া নিজেও যখন কারও ভেংচি কাটবে তা স্থূল বা সূক্ষ্ম যাই হোক না কেন, কেউ যদি তাতে আনন্দ পেয়ে বাহবা না দেয় তো সে নিজেই নিজের বাহবা দেবে। সে এত হাসবে আর চেঁচাবে যে তা শুনে আপনাকেও তাতে যোগ দিতে হবে।

শিখ মেয়েটির চেহারা মামুলি ধরনের। নাক-নকশা দারুণ মোটা। কপাল খুব ছোট। একেবারে পুরুষালি। রফিক তার সঙ্গে কথা বলছিল; কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, অনর্থক কথা বলছে। তার প্রতি মোটেও আগ্রহী নয় সে। এটা শুধু কথা বলার বাহানা। রফিকের কথায় সুস্পষ্ট মনে হচ্ছিল, সে মেয়েলোকটার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। কিন্তু তার ঘাড়ে তো অশোক কুমারের ভূত সোয়ার হয়ে আছে। রফিক যখন খোলাখুলি চাপ দিল তখন মেয়ে লোকটি দেহাতি মেয়েদের ভঙ্গিতে বলল ঃ শোন্ রফিকা, আমি কুত্তার সঙ্গে·····।"

রফিক তাকে আর এগুতে না দিয়ে বলল ঃ থাম, থাম—তুমি জান না—আমি খুব উঁচু জাতের কুকুর—আর খুব বড় কুকুর।

জাত-পাত জানিনে, তবে এটা বলতে পারি যে, গজনভী সত্যি একটা বড় কুত্তা। যার লেজ একমাত্র নস্টা মেয়েদের কাছে নুয়ে পড়ে। কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা লাখো চেষ্টায়ও তাকে বাগ মানাতে পারে না।

এটাই ছিল আমার প্রথম সাক্ষাৎ। এরপর আমরা একে-অপরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে থাকি। আমি এখানে তার চরিত্রের আরেকটি দিক উদঘাটন করতে চাই। সেটা হল, একটা নিম্নস্তরের হীনমন্য, ছ্যাবলা, স্বার্থপর। সবার আগে সে নিজের কথা ভাবে। সে খেতে জানে, কাউকে খাওয়াতে জানে না। অবশ্য কোন মতলব থাকলে নিমন্ত্রণও করে বসে। কিন্তু সে নিমন্ত্রণে মেহমানদের মাত্রও খেয়াল না করে মুরগীর বড় রানটা নিজের পাতে তুলে নেবে।

সে কোন বন্ধুকে সিগ্রেট অফার করতো না। একটা ঘটনা বলি। আমার তখন বেশ অভাব চলছে। এক স্টুডিওতে রফিকের সাথে দেখা। যুদ্ধের সময় সব ভাল ব্রাণ্ডের সিগ্রেট কালো বাজারে চলে গেছে। তার হাতে একটা ক্রাভেন 'এ' সিগ্রেটের কৌটা দেখলাম। এটা আমার খুব প্রিয় সিগ্রেট। আমি হাত বাড়িয়ে কৌটা নিতে গেলাম, তখন সে হাত সরিয়ে নিল। আমি বললাম ঃ ভাই একটা সিগ্রেট দাওনা।

রফিক একটু সরে দাঁড়িয়ে কৌটা পকেটে পুরে বলল ঃ না মাল্টো, প্রথমতঃ আমি কাউকে সিগ্রেট দিই না। দ্বিতীয়তঃ এটা হল দামী সিগ্রেট—তোমার অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে। তুমি তোমার গোল্ডফ্লেক খাও। আমার পরিচিত আরও তিনচার জন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি লজ্জায় মরে গেলাম। কি করব বুঝতে পারলাম না। নিরুপায় হয়ে পা চুলকাতে লাগলাম।

রফিকের আত্মসম্মান জ্ঞান মাত্রও ছিলনা। যদিও সে পাঠান, কিন্তু পাঠানী আত্মমর্য্যাদা তাতে ছিল না। শুনেছি জোহরার সাথে যখন তার সম্পর্ক হয় তার আগে জোহরার মায়ের সাথেও তার সম্পর্ক ছিল। তারপর তার বড় মেয়ে মুশতারীর সঙ্গেও। তার-পর জোহরা, আর সবশেষে শয়দাঁ।

জানি না শয়দাঁর সঙ্গে কি করে তার ভাব জমল। তখন সে মহমে থাকতো। এ্যারকলোটভ ম্যানসনের ওপর তলায় তার ফ্লাট ছিল। তার ফ্লাটের সামনেই আমার বোনের বাসা।

আমার তখন বিয়ে হয়েছে আর আমি ক্লেয়ার রোডের এড-লফি চেম্বারে থাকি। রফিক আমার বাসায় আসা-যাওয়া করত। রেডিও স্টেশনেও আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হত। একদিন প্রোগ্রাম শেষ করে বের হলে, দেখলাম খুবই ব্যস্ত রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আজকাল কি করছ, আর শুকিয়ে যাচ্ছ। প্রেম করছিল সত্যি। একদিন শুনলাম জোহরার ছোট বোন খুরশীদ (শয়দাঁ) আফিম খেয়েছে। দু'বোনে দারুণ ঝগড়া হয়েছিল। জোহরার দারুণ ক্রোধ হল যে, শয়দাঁ তার স্বামীকে কেড়ে নিচ্ছে। এদিকে উত্তিন্ন যৌবনা শয়দাঁ জানে না যে তার ফেকু ভাইজান তাকে কত পেয়ালা প্রেমের মদিরা পান করিয়েছে। তার আপাদ মস্তক নেশায় চুর

হয়ে আছে। বলা হয় যে, প্রেম ও যুদ্ধে সব কিছুই বৈধ। সে ঠিক পথে আছে বলে মনে করত। তাছাড়া স্বয়ং ফেকু ভাইজানও তার বড় বোনকে বাঁধা দিচ্ছে। গালাগালি চুলো-চুলিতে পরিণত হল। তার ফলে শয়দাঁ তার বড় বোন জোহরার অফিমের কৌটা চুরি করে নিল জান দেবে বলে। কিন্তু যাকে আল্লাহ রাখে তাকে মারে কে। সে শহীদ হতে হতে বেঁচে গেল। আর তার ফল শ্রুতিতে রফিক জোহরার মনের কুঠরি খালি করে শয়দাঁর মনের কোঠায় অবস্থান করতে লাগল।

শুনেছি সে কখনও ছুটির দিনে শয়দাঁর মোটা বোন হীরার মনের ডাক বাংলোতে গিয়েও হানা দিত।

রফিকের প্রেম যখন উত্তুঙ্গে, তখন মহমের লেডী জামশেদ রোডের গুলশন মহলে লাহোরের এক লালাজী এসে উঠেছিল। তাঁর সাথে ছিল জেবুন্নিসা নাম্নী এক সুন্দরী মেয়ে। মুখে আগুন দেওয়ার জন্যে প্রচুর অর্থ ছিল। তিনি এসব মাত্রও আমলে আন-তেননা যে, তাঁর জেবু তাঁকে লুকিয়ে কি করে। তিনি সর্বদা তাঁর নির্বুদ্ধিতার মধ্যে ডুবে থাকতেন। রফিক দু' একবার লালা-জীর সঙ্গে দেখা করতে আসায় জেবুর সঙ্গে তার চোখ ঠারাঠারি হয়ে যায়। মেয়েটি খুব সর্বল ছিল। সে বেচারী ঘরের দামী দামী চাদর, বালিশের ওয়াড়, শতরঞ্জি সব রফিককে দিয়েছে। তাছাড়া রফিককে সব সময় খাওয়াতো। কিন্তু রফিক খুব তাড়া-তাড়িই তার প্রতি নিরাসক্ত হয়ে গেল। আমি কারণ জিজ্ঞেস করায় বলল খুবই ভদ্র মেয়ে, আমি আনন্দ পাইনে এদের দিয়ে।

মেয়েদের ভদ্রতা রফিক মাত্রও সইতে পারতো না। কেন যে তা জানি না। হয়তো জীবনের শুরু থেকেই তার এধরণের মেয়েরও সঙ্গলাভ হয়ে ছিল।

আমার মনে হয়, অশ্লীল কথা বলা, অশ্রাব্য ব্যঙ্গোক্তি আর বাজারি ধরণের কৌতুক অঙ্গের ভূষণ বলে রফিক কোন ভদ্র কন্যার প্রতি অকৃষ্ট হয় না। নারীত্ব অর্থাৎ স্ত্রীত্ব তার দৈহিক অনুভূতিকে নাড়া দেয় না।

তার অর্ধ-বায়রনী জীবনে যে সব মেয়েরা এসেছে, সে তাদের নাগর নয়, খদ্দের—সাধারণ খদ্দের নয়—বিশেষ খদ্দের—(যারা পতিতার কাছ থেকে নেয় শুধু দেয় না কিছুই)। যেমন রফিক তার প্রথম জীবনে ছিল রফিকের কাছে পতিতার মতই। প্রতি রাতেই সে তার সঙ্গে শোয়—সকালে ওঠে প্রথম নিশ্বাসের সাথেই শুরু হয় তার ঠকবাজি। তারপর শুরু হয় ফক্কর বাজি। এভাবে প্রতিটি দিন শেষ হয়ে যায় তার। কিন্তু তাকে কখনও আমি বিষন্ন দেখিনি। সে নির্লজ্জভাবেও সর্বদা খুশি থাকতো। এটাই হয়তো তার সুস্থতার কারণ। এত বয়েস হওয়া সত্ত্বেও তাকে আপনি বয়স্ক মনে করতে পারবেন না। বরং যতই তার বয়েস বাড়ছে সে ততই যেন জওয়ান হয়ে চলেছে। আমি মোটেই বিস্মিত হব না যদি তার একশ' বছর পুরো হতে হতে সে একটা শিশুতে পরিণত হয়ে আঙ্গুল চুষতে শুরু করে।

তখন সে শিবাজী পার্কে থাকত। শয়দাঁ মৃত সন্তান প্রসব করেছে। আমি সস্ত্রীক শোক প্রকাশ করতে গেলাম। সেখানে গিয়ে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলাম।

রফিক মেঝের ওপর কারাকুলি টুপি পরে নামাজ পড়ার ভঙ্গিতে বসে ছিল। আমরা ভেতরে যেতেই জোহরা কালো মাতমী পোশাক পরে অপর কামরা থেকে বেরিয়ে এল। চুল খোলা, চোখ ভেজা। সাথে তার স্বামী মির্জা সাহেব। তিনি রফিকের সন্তান বিয়োগে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। অপর কামরা থেকে শয়দাঁর কান্নার শব্দ পেয়েই জোহরা দৌড়ে সেখানে গিয়ে তাকে সান্তনা দিতে লাগল। আমি রফিকের পাশে হতভম্ভ হয়ে বসে চিন্তা করতে লাগলাম ঃ হায় আল্লাহ্! একি তামাশা।

রফিক কোন সময়ে জোহরার স্বামী ছিল। জোহরার গর্ভে তার দুটি সন্তান জন্মেছিল। তারা এঘর ওঘর করে বেড়াচ্ছিল। রফিক এখন শয়দাঁর স্বামী আর জোহরার স্বামী হলেন মির্জা। শয়দাঁ ছিল জোহরার বোন আবার সতীনও। রফিকের সন্তান শয়দাঁর কি হয়? বোনের সম্পর্কে তো পারভীন আর মাহমুদ ভাগ্নী ও ভাগ্নে। আর শয়দার যে মৃত সন্তান হল, সে জোহরার ভাগ্নে। পারভীন আর মাহমুদ রফিকের ঔরসজাত মৃত সন্তানের ভাই। আর

মির্জা হল রফিকের শ্যালীপতি ভ্রাতা। আমি আর চিন্তা করে কুল পেলাম না। এমন সময় রফিক আমাকে মুক্তি দিল। সে বলল ঃ চল বাইরে যাই।

আমরা বারান্দায় এলাম। রফিক সিগ্রেট জ্বালিয়ে বলল ঃ দুর ছাই, শোক করতে করতে চেহারা বিগড়ে গেছে। বলেই সে হেসে উঠল।

আত্ম সন্মান, লজ্জা শরম সম্ভবত মনুষ্য চরিত্রের বাড়তি জিনিস। আপনি বিতর্কে অবতরণ করতে চান তো আমি সত্যি বলে মেনে নেব।

যদি বলি, সমকামকে কেন অস্বাভাবিক বলে মনে হয়? যখন মানুষের প্রকৃতিতে এ ধরনের অসঙ্গতি আদিম যুগ থেকেই রয়ে গেছে? যদি এমন কথা বলেন, তাহলে যতই দুর্বলমনা ভাবুন, প্রতিক্রিয়াশীল বলুন—কিন্তু এসব মনে হলেও আমার দারুণ ঘৃণা হয়।

বেশ কিছুদিন হল, আমি বোম্বে থেকে কোন মোকদ্দমার ব্যাপারে লাহোর এসেছিলাম। সে সময় রফিকও সেখানে ছিল। সৈয়দ সালামতুল্লাহ্‌র নিলাম ঘরে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। আল্লাহ্ মাফ করুন, সাহেব অতিশয় রসিক ও নধর লোক ছিলেন। তাঁর কাছে রফিকের কথা বলায় তিনি বললেন, ভেতরের কামরায় আছে ; বেশ ফুর্তিতেই আছে।

জানতে পারলাম যে, অমৃত সরে গিয়ে সে তার মেয়ে জরিনার (নাসরিন আনোয়ারীর গর্ভজাত) সঙ্গে দেখা করে এসেছে। রফিক ছোটবেলায় তাকে দেখেছিল। তার যৌবন দেখবার সুযোগ হয়নি। আসলে আনোয়ারী তাকে এমন সুযোগই দেয়নি যে নাসরিন তার বাপকে দেখতে পায়। তাকে বলা হয়েছিল সে খুবই কুৎসিত আর বদমাশ।

রফিকের বন্ধুরাই পরামর্শ করে এই পরিকল্পনা করেছিল পিতা-পুত্রীর সাক্ষাৎকারের। রফিক অমৃতসরে গিয়ে জরিনার সঙ্গে দেখা করে। রফিক বলল ঃ মান্টো, আমার মেয়ের আপাদ মস্তক সৌন্দর্যের প্রতিমা—যৌবন উপচে পড়ছে। আমি যখন তাকে দুহাতে জাপটে ধরলাম—খোদার কসম, যা ভালো লাগলো·····।

আমি তার এ উক্তির ওপর কোন আলোচনা করতে ইচ্ছুক নই। রফিক আমাকে আরও বলল যখন হঠাৎ আনোয়ারী এসে পড়ল, বেশ একটু হৈ চৈ হল। আমি বললাম ঃ চুপ কর্ আনোয়ারী, শোকর আদায় কর যে, আমি তোকে একটা সোনার খনির মালিক বানিয়ে দিয়েছি।

জানি না রফিক এধরনের সোনারখনি আর কাকে দান করেছে। শেষেবিচারের দিন যখন খনন করা হবে তখন জানা যাবে। এমনি রফিকের কত সন্তান সন্ততি আছে তা আমার জানা নেই। আল্লাহ্ই জানেন, তিনি সবচে বড় গণনাকারী।

রফিকের একটা 'আপন' স্ত্রীও ছিল। অর্থাৎ শরিয়ত মোতাবেক বিবাহিতা—বিয়ের তিনচার বছর পর মারা যায়। তার গর্ভজাত মেয়ের নাম জাহেরা—প্রথমে সে ফিল্ম ডাইরেকটর জিয়া সরহাদীর স্ত্রী ছিল। পরে তালাক নিয়ে তার বাপের কাছে করাচীতে থাকে।

এই মেয়েটির জীবন অসময়ে ধ্বংস হওয়ায় আমার দারুণ দুঃখ হয়। আমার মনে হয়, এব্যাপারেও রফিকের হাত আছে। কেননা সে সব সময়ই তার কাছে নিজের জীবনের "আদর্শ" প্রচার করত। আর বলত, তুমি এমন ভাবে জীবন গড়ে তোল। কিন্তু এ সত্য সে বুঝতে পারল না কেন জানি না। যার ফলে সে আজ এমন শোচনীয় ও জঘন্য জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। তার বিয়ের ব্যাপারে বোম্বেতে দারুণ হৈ চৈ হয়েছিল। সেটাও রফিক গজনভীর অবহেলার দরুণ। এটা যাতে না হয় সেজন্য সে জাহেরাকে বলেছিল, দেখ্ মেয়ে-তুই নজির লুধিয়ানবীর সঙ্গে বিয়ে না করিস তো জিয়া সারহদির সঙ্গে কর। দ্বিধা যদি করিস তো দুজনকেই হাতে রাখ্। আর সে যদি তোমাকে ধোকা দেয় তো চিন্তার কারণ নেই। আমি তো রয়েছি। আমি যে তোর বাপ।

নাজির লুধিয়ানবীকে ধোকা ছিল জাহেরা। আর জাহেরাকে ধোকা দিল জিয়া সারহদী। এখন সে তার (সবচে বড় স্বামী) বাপের কাছে থাকে। বিড়িটানে আর তার ছাই দিয়ে যৌবনের সমস্ত চুলকালি গুলো খামছে খামছে বের করবার নিরর্থক চেষ্টা করে, যা একদিন শান্ত সমাহিত রূপ ধারণ করতে পারতো।

আমি তাহেরা সম্বন্ধে বেশি কিছু লিখতে চাইনে। তাতে আমার দুঃখ আরও বাড়বে।

এই বয়েসেও রফিকের মনে খেলোয়াড়ি মনোভাব রয়েছে। সামান্য কথাতেই সে হেসে লুটিয়ে পড়ে। আরও খুশী হলে নাচানাচি শুরু করে।

আমরা তখন ফিল্মিস্তানে 'চল্ চল্ রে নওজোয়ান' নামের ছবি করছিলাম। হিরো ছিল অশোককুমার আর হিরোইন পরীচেহারা নাসীম বানু—রফিকও সেই ছবিতে একটা রোল করছিল। সে নাসিমের মা ছিমিয়াঁকে জানতো। এককালে সে দিল্লীর আলোড়ন সৃষ্টিকারিনী বাইজি ছিল।

দিল্লীতে একবার ছিমিয়াঁর (শামসাদ) বালাখানায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল রফিকের। ছিমিয়া গাচ্ছিল, সেই সঙ্গে বেলোয়ারী সোরাহি থেকে পেয়ালা ভরে মদিরা পানও চলছিল। মুজরার শ্রোতা আরও ছিল শহরের রইস লোকেরা। ছিমিয়া তাকে ইসারায় ডাকলো এবং কাছে এলে এক পেয়ালা পান করতে দিল। এখানে রফিক পনের দিনের জন্য ছিমিয়ার কাছে গৃহবন্দী হয়ে রইল।

আমি নাসিমের সাথে তার পরিচয় করালাম। খুব ছোট বেলায় সে নাসিমকে দেখেছিল। রফিকের কথায়, সে সময় চুনরিয়া (ওড়না) পরে নেচে নেচে বেড়াতো।

নাসিম রফিককে জানতো। তাদের কথা বার্তাও হল খুব পোশাকী ধরনের। তার কারণ নাসিম আদব কায়দার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাশীল ছিল। এমন কোন সুযোগই সে তাকে দিল না, যাতে কথাবার্তায় "ঢিলেমি" প্রকাশ করে। কিন্তু রফিক তাতেই খুশী ছিল। এত খুশী যে আমার কামরায় পৌঁছেই সে ভীষণ ভাবে নাচতে লাগল। নাসিমের সৌন্দর্য নিয়ে সে আকাশ পাতাল তোলপাড় করে ফেলল। কখনও টেবিলে চড়ে, কখনও মেঝেয় বসে পড়ে। গড়াগড়ি দিয়ে, টেবিলের নিচে যায়। উঠবার সময় মাথা ঠুকল টেবিলের সাথে—তা গ্রাহ্য ও করল না—সেখান থেকে বেরিয়েই গান ধরল, 'ওহ্ চলে ঝটক্‌কে দামন মেরে, দস্তে না তোয়াঁ সে—ওহ্ চলে ওহ্ চলে—ওহ্ চলে—

আমার ধারণা রফিক নাসিমের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। কিন্তু এখানে তো আঙ্গুর ফল টক—তাই সে এ ব্যাপারে আর বেশি অগ্রসর হল না—শুধু দেখেই মন খুশী করতে লাগল। অরোরার সাথে রফিকের বিবাদ ছিল। এর মধ্যে অভিনেতা নাজিরও ছিল। এই হৈ হল্লার গাঁট খুলতে খুলতে রফিক সিতারার গাঁটও খুলে ফেলেছিল—যা রফিকের বা সিতারার কারুরই জানা ছিল না।

সোহরাব মোদী "সিকান্দর" নির্মাণ করছিল। জহর আহমদ "পোনপল" (বোম্বের পতিতালয়) থেকে এক উদ্ভিন্ন যৌবনা পতিতা মীনাকে তুলে এনে বিয়ে করেছিল। সেও মিনার্ভা মুভিটোনে চাকরি করত। "সিকান্দর" ফিল্মের জন্য রফিক একটা মার্শাল কোরাস লিখেছিল, বোধহয় সেটা এই রকম; জিন্দেগী হ্যায় প্যার সে প্যার, প্যার সে বিতায়ে জা, হুসন্ কী হজুর মে আপনা সর্ ঝুকায়ে জা।

এই কোরাস খুবই জনপ্রিয় ছিল সেকালে। হয় তো এই আনন্দেই সে মীনার হুস্ন কী হুজুরে আপনা ছের্ (শির) ঝুকায়ে ছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ ঝুকায়ে রাখতে পারেনি। দু-তিন সিজদার পরই তুলে নেয়া হল।

হায়দ্রাবাদ থেকে দু'বোন এসে পোনপলে বাস করছিল। সম্ভবতঃ শাহজাদা মুয়াজ্জম শাহ্-এর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল, বড় জনার নাম ছিল আখতার আর ছোটর আনোয়ার। তাদের আসল বাড়ী ছিল আগ্রায়। আনোয়ার এর বয়স একেবারে কাঁচা ছিল। এই প্রায় চৌদ্দ পনের বছরের। দু'জনই মুজরা করত। আনোয়ারের মিস্সী (বৃত্তির স্বীকৃতি অনুষ্ঠান বিশেষ, আবার কোথাও এটাকে 'নথিয়া উতারনা' নথভাঙ্গা বলে) হয়নি তখনও। আমার দিল্লীর একবন্ধু যার নাম ছলদিয়া সাহেব, তিনি বড়টির জন্য পাগল ছিলেন।

ছলদিয়া সাহেবের সাথে আমি একরাতে দুই বোনের বালাখানায় যাই। মুজরার পরে রফিকের কথা উঠল। আমি বললাম: আস্ত হারামজাদা।

ছোট বোন (আনোয়ার) তীব্র হাসির সাথে বলল: আপনার চেহারার সঙ্গে কিন্তু তার অনেক মিল আছে।

আমি আর এ কথার জওয়াব দিতে পারলাম না। মনের আগুন মনেই চেপে রাখলাম।

আমার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে সে সেখানে যাতায়াত শুরু করে। প্রায় এক বছর সে যাতায়াত করছে সেখানে। রফিক ভবিষ্যদ্বানী করেছিল আনোয়ার একদিন বিখ্যাত গায়িকা হবে। ঠুমরিতে তার কোন তুলনাই থাকবে না। যাঁরা তার ঠুমরি শুনেছেন তাঁরা ঠিকই এর সত্যতা স্বীকার করবেন।

বোম্বাই-এর পরে আমি এক সঙ্গে আনোয়ার বাই আগ্রাওয়ালী কে দিল্লী রেডিওতে দেখি। তখন একেবারে হাড্ডিসার দেহ। হায় আল্লাহ্ এ কেমন পরিবর্তন হয়েছে; এখন সে যেন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস—বড়ই নাজুক—বাতাসের সামান্য প্রবাহে যেন ঝরে যাবে।

মাইক্রোফোনের সামনে পাশ বালিশ অবলম্বন করে সে বসত আর তানপুরার সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে দিত। যেন তার সরু গ্রীবা মাথাটা বইতে পারছেনা। পোনপলের সেই চঞ্চল কিশোরীর সেই প্রাণ চাঞ্চল্য, মোহময়তা কোন্ নিষ্ঠুর তার নখরাঘাতে হরণ করে নিয়েছে। যখন সে গান গাইল, তার সুর সবার মনের গভীর কন্দরে গিয়ে প্রবেশ করল।

রফিক যতটা না গায়ক তার অনেক বেশি ছিল খেলোয়াড়। সে আপনাকে তার গান শোনানোর আগেই অস্থির করে ফেলবে। যন্ত্রের পরদায় আঙুল রাখবে তারপর সমস্ত দেহ স্পন্দিত করে বলবে, হায়। এই হায় দীর্ঘতর হবে। তারপর আরেক পর্দায় হাত রাখবে এবং আগের চেয়েও দীর্ঘতর 'হায়' বলবে—যাতে শ্রোতাদের দেহে শিহরন জেগে ওঠে। তারপর সে হারমোনিয়ামে হাওয়া ভরবে, তার চোখের মনি স্থির হবে এবং এক মর্মভেদী আর্তি তার পাঁজর ভেদ করে বের হবে। আরেক পর্দায় হাত দিতে তার অবস্থা সংজ্ঞাহীনের মত হয়ে যাবে। শ্রোতারা যখন প্রায় মাথার চুল ছিড়তে শুরু করে বা কাপড়ই ছিড়ে ফেলে—তখন সে হো হো করে হেসে ওঠে এবং তারপর ঠিকমত গাইতে থাকে। আপনার মনে হবে শ্রাবণের মেঘ কেটে যাওয়ার পর তৃষ্ণার্ত ধরণীর বুকে কেউ যেন পানি সিঞ্চন করে গেল।

গাওয়ার সময় সে মুখ বিকৃত করে নানাভাবে—মনে হয় যেন তার কোষ্ঠ কাঠিন্য আছে অথবা পেটে অসহ্য ব্যথা হচ্ছে, তাই সে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তাকে গাইতে দেখে (বিশেষ করে যখন সে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গায়) হয়তো তখন আপনার নিজেরই কষ্ট হবে—অথবা তার জন্য দুঃখ অনুভব করে অকপটে খোদার কাছে তার কষ্ট লাঘবের জন্য দোয়া করবেন।

আজরা মীর বোম্বের ধনী ইহুদীদের সহায়তায় বহু টাকা ব্যয়ে একটা ফিল্ম কোম্পানী স্থাপন করেন। তাঁদের প্রথম ছবি "সিতারার" জন্য রফিককে মিউজিক ডাইরেকটর নিয়োগ করেন। আজরা মীর অত্যন্ত সুপুরুষ—তার সঙ্গী ইহুদী পুঁজিপতি ও সুন্দর চেহারার লোক ছিল। কিন্তু রফিক যখন এদের পাশে দাঁড়াতো, তখন তাকেই সবচে' সুদর্শন মনে হতো।

রফিক খুব ঠাঁটের সঙ্গে কাজ শুরু করত। শতাধিক বাদ্য-করের মাঝে দাঁড়িয়েও সে সকলকে উপদেশ দিতে পারে। পাঞ্জাবী মিরাসিদের সাথে তাদের কথার অনুকরণ করবে, সেই হাসি ঠাট্টা ব্যঙ্গ কৌতুক চলবে সমানে। খৃষ্টানদের সাথে ইংরাজী বলবে, ইংরেজিতে ঠাট্টা তামাশা করবে, আর ইউ পির লোকদের সাথে লাখনোবী উর্দু বলবে।

একদিন অফিসে বসে রফিক ও আজরা মীর গানের বিষয়ে আলোচনা করছে। আমিও সেখানে ছিলাম। কথা বলতে গিয়ে সে হঠাৎ থামল। অফিস থেকে দূরে মিউজিক রুম। বাদ্যযন্ত্রীরা সেখানে একটা কম্পোজিশনের রিহার্সাল দিচ্ছিল। যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল রফিক সেদিকে কান খাড়া করে শুনে নাসিকা কুঞ্চন করে বলল ঃ ড্যাম ইট—একটা ভায়োলিন আউট অব টিউন। সে উঠে মিউজিক রুমে চলে গেল।

আমি সঙ্গীত-প্রিয় নই। যদিও আমি সমসাময়িক কালের বড় বড় গায়ক-গায়িকার গান শুনেছি, কিন্তু এই বিদ্যা শিখতে পারিনি। তবে রফিক সম্বন্ধে একথা বলতে পারি তার গলায় সুর নেই। সঙ্গীত বিদ্যা সে কতটা জানে সে ব্যাপারে রায় দেয়া আমার পক্ষে বাড়াবাড়ি হবে। তবে যারা সঙ্গীতে পারদর্শী এবং সঙ্গীত জগতে যাদের নাম আছে, তাদের বক্তব্য হল, রফিক বেসুরো—

সুর থেকে এক দুই সুত্র সরে গিয়ে সে গান করে। এব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন।

কিছুদিন আগে আমি নূরজাহানকে রফিক সম্বন্ধে বলেছিলাম—আমি তার কাছে রফিক সম্বন্ধে উপরোক্ত মতামত ব্যক্ত করায় সে জিব কেটে দু'কানে আঙুল পুরে বলল: তৌবা, তৌবা এটা শুধু মিথ্যাচার—সে একজন ওস্তাদ, নিজের ঢঙে সে অনন্য সাধারণ। কিন্তু অবশেষে সে স্বীকার করল এখন আর রফিকের গলায় সেই তেজ নেই। আর এটা তো বয়স হলেই হয়ে থাকে। তবে বিদ্যার দিক থেকে রফিক গুনীলোক—নূরজাহান তাই বলল।

তার একটি গুণ আমি স্বীকার করতে রাজি। সে নির্লজ্জ অপমান বোধহীন, কিন্তু অবিবেচক নয়। তার চালচলন একজন সাধারণ মানুষের মত নয়—একজন শিল্পীর মত। সে যদিও শরীয়তের পাবন্দ নয়, তবু প্রচলিত আইনের বিরোধী নয়। সে কারো বন্ধু নয়—শত্রুও নয়। যদিও সে সত্যিকার অর্থে কারও স্বামী নয়—তবু সে কাউকে বাধ্য করে না তার সত্যিকার স্ত্রী হতে।

দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের এক শিক্ষিতা তরুণী রফিককে ভালবেসেছিল। বহুদিন যাবৎ সে রফিকের কাছে প্রেম-পত্র লিখতে থাকে। রফিক তখন বোম্বে থাকত। মেয়েটি এমন এক চিঠি ছাড়ল যার ফলে রফিক বেশ অধীর হয়ে পড়ল। আমার দারুণ বিস্ময় হল, রফিকের জীবনে অস্থিরতা—এটা পরস্পর বিরোধী।

পরে রফিক আমাকে সব খুলে বলল: মান্টো, মেয়েটি পাগল হয়েছে। আমার মতো লোকের কাছে প্ল্যাটোনিক প্রেমের কীইবা দাম। বলে সে কিনা বাড়ি থেকে পালিয়ে আসবে আমার কাছে। আসে—আসুক। কিন্তু আমি কতকাল তার ভদ্র ও পবিত্র প্রেমে আটকে থাকব। খোদা করুন, সব ভদ্র মেয়ে যেন তাঁদের ঘরেই থাকেন, তাঁদের বিয়ে হোক, বাচ্চা হোক—জাহান্নামে যাক—তাদের প্রেম, আমার প্রয়োজন নেই। আমি তো সারাজীবন অচল মুদ্রাই চালালাম। খাঁটি জিনিস আমার কাছে চলে না।

সুতরাং রফিক মেয়েটিকে এমন কড়া চিঠি দিল যে, মেয়েটি শেষে হতাশ হয়ে তার ইচ্ছা দমন করল।

রফিকের জন্য আমার এই লেখাটা অসম্পূর্ণ রইল। আমি তাকে নিয়ে যদি ধারাবাহিকভাবে কোন সংবাদ পত্রে মোটা বই লিখি, তাও অসম্পূর্ণ থাকবে। কারণ তার হাজার হাজার চারিত্রিক গুণাবলী কয়েকটি পৃষ্ঠায় মসীলিপ্ত করা অসম্ভব। যদি বেঁচে থাকি তাহলে তার সম্বন্ধে আমি আরো লিখব।

আরেকটা ঘটনা বলেই আমি শেষ করি।

ফিল্ম চল্ চলরে নওজোয়ান তৈরির সময় রফিক প্রডিউসার এস, মুখার্জী, ডাইরেক্টর জ্ঞান মুখার্জী, অশোক কুমার, সন্তোষজী, শাহেদ লতিফ ও আমাকে নিমন্ত্রণ করে। আমরা সময় মত রফিকের বাসভবন শিবাজী পার্কে গেলাম, রফিক হারমোনিয়াম সামনে নিয়ে হালকা আনন্দে বসে ছিল। পাশে শয়দাঁ আর তার ভাই ছিল। আমরা যেতেই সে অভিনন্দন জানালো, আমাকে গালাগালি করে আর সকলকে সালাম জানিয়ে।

দু'তিন দফায় মদ খাওয়া হল। সবাইকে সে স্কচ দিল আর আমাকে দিল সোলন—অর্থাৎ দেশী। সে তার অভ্যাস মত কথায় কথায় আমাকে গালি দিয়ে চলল। আমি কোন জওয়াব দিলাম না। খাবার দেয়া হল। সেখানেও রফিক তার অভ্যাস মত মুরগীর মাংসের ভালো টুকরোগুলো নিজের পাতে নিয়ে নিল।

খাবার পর একে একে সবাই চলে গেল। আমি বসে রইলাম। শয়দাঁ ভেতরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। রফিক বেশি মদ খেতে পারত না। সে বরাবরই বোম্বের ভাষায় 'চেকার' অর্থাৎ স্বল্পপায়ী ছিল। তাছাড়া ভূরিভোজে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালাম, তারপর পাশের ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্তে আলমারি খুলে স্কচের বোতল নিয়ে এলাম। অর্ধেকের বেশি ছিল না। আমি আরামে পান করতে লাগলাম। সেই সাথে তার শালাকেও দিলাম। মাঝে মাঝে রফিককে খোচা দিচ্ছিলাম—সে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়েই কিছু রসালো গালি দিতে লাগল।

তারপর আমি গালি বকতে শুরু করলাম। রফিক তা শুনে জ্বলতে লাগল। তবে আমার গালির তালিকা তত লম্বা নয়। দু'তিন বার মুখ ভরেই শেষ হয়ে গেল। তারপর আমি একটা গালির অর্ধেকের সাথে আরেকটার অর্ধেক মিলিয়ে বললাম। কিন্তু

এ নিয়মও বেশিক্ষণ চলল না। তবে মনে করলাম ও বেটার তো সংজ্ঞা নেই—যা মুখে আসে তাই বলে চলে। সুতরাং তাই করলাম। রফিক নেশায় মত্ত হয়ে শুধু মোচড় খেতে লাগল। অবশেষে জড়িত কণ্ঠে বলল ঃ ছাড় মান্টো, আমার প্রানের ভাই, আমি খুব ক্লান্ত। তখন আর আমার গালি দেয়ার শক্তিও ছিল না।

আমি যে তাকে নিয়ে এই প্রবন্ধ লিখেছি নিশ্চয়ই সে তা পড়ে স্বভাব সিদ্ধ কায়দায় আমাকে কষে অশ্লীল গালি দেবে। কিন্তু আমি এখন লাহোরে আর সে এখন করাচীতে। বর্তমানে নিরাপদেই আছি। অবশ্যই সে লাহোরে এলে আমাকে তার নোংড়া গালি শুনতে হবে আবার। তারপর আমি তাকে নিমন্ত্রণ জানাবো।

দুষ্প্রাপ্য বই/ Rare Collection

বইটি সাবধানতা এবং মমতার
সাথে ব্যবহার করুন।

রহস্যময়ী নীনা

আসল নাম শাহেদা। মোহসিন আব্দুল্লার অনুগত স্ত্রী এবং মোটা-মুটি আনন্দেই সংসার ধর্ম পালন করছিল সে। আলীগড়ে অবস্থান কালে তাদের মাঝে প্রেম হয় এবং এই প্রেম দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকে।

স্বামী ছাড়া পর-পুরুষের প্রতি চোখ তুলে দেখাও যারা অপছন্দ করতো, শাহেদা ছিল সেই ধরনের মেয়ে। কিন্তু মোহসিন আব্দুল্লাহ্ ঠিক তার বিপরীত। সে ছিল নানা ফুলের মধু আহরণকারী। শাহেদা কিন্তু তার স্বামীর এই স্বভাব জানতো না। সে শুধু এই টুকুই জানত তার স্বামীর বোনেরা অত্যন্ত স্বাধীন চেতা মেয়ে এবং পুরুষদের সাথে দিব্যি মেলামেশা করে থাকে। এমন কি তারা পুরুষের সাথে যৌন আলোচনা করতেও কুন্ঠিত হয় না। শাহেদা তাদের এসব চাল-চলন দু'চোখে দেখতে পারতোনা।

মোহসিনের এক বোন (ডঃ রশীদ জাহান) একবার এমন এক কেলে-ঙ্কারী করে বসল যে, কারো আর মুখ দেখাবার জো থাকলোনা। তখন আমি অমৃতসরের এম, এ, ও, কলেজে পড়তাম। আমাদের কলেজে এক নতুন প্রফেসর এলেন, যার নাম প্রফেসর মাহ্মুদ-জ্জফর—ইনি ছিলেন ডাক্তার রশীদ জাহানের স্বামী।

প্রফেসর সাহেবজাদা মাহমুদজ্জফর অত্যন্ত সুদর্শন যুবক ছিলেন। একটু বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্নও। সেই কলেজে ফয়েজ সাহেব, যিনি একটু তুরীয় ভাবাপন্ন ছিলেন—তিনিও অধ্যাপনা করতেন। তার সঙ্গে আমার খুব খাতির ছিল।

এক শনিবারে সন্ধ্যায় তিনি আমাকে বললেন তিনি দেরাদুন যাচ্ছেন। তার জন্য কিছু জিনিষপত্র কেনাকাটা করে দিতে বললেন আমাকে।

এভাবে প্রতি সপ্তাহেই তাঁর ফাই ফরমাশ খাটা আমার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল।

তিনি আসলে দেরাদুন যেতেন ডাক্তার রশীদ জাহানের সাথে প্রেম করতে। তার সাথে হয়তো প্রেমের মতই কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। জানিনা সে সম্পর্কের পরিণতি কি হল। কিন্তু ফয়েজ সাহেবের তুরীয় ভাব থাকা সত্ত্বেও তখন বেশ ভালো কয়েকটি গজল লিখেছিলেন।

এসব হল পটভূমিকা। মোহসিন আব্দুল্লাহ কোন এক বন্ধুর মারফত বোম্বে টকিজে চাকুরী পেয়েছিলেন। সে সময়ে এই ফিল্ম কোম্পানীর অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। এই কোম্পানীর প্রানকেন্দ্র ছিলেন হিমাংশু রায়। তিনি শৃঙ্খলা ও ভালো পরিবেশ পছন্দ করতেন। তাঁর ইচ্ছা, তাঁর স্টুডিওতে শিক্ষিত লোকেরা কাজ করবে।

মুহসিন আব্দুল্লার চাকুরী ল্যাবোরেটরীতে হয়েছিল। পরলোকগত হিমাংশু রায়ের নির্দেশে এই মিলাদ কোম্পানীর উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর কর্মচারীদের দূরে থাকবার অনুমতি দেওয়া হত না। প্রায় সবাই স্টুডিওর আশে পাশেই থাকতো। মোহসিন আব্দুল্লাহও তার স্ত্রী শাহেদাকে নিয়ে কাছেই একটা জীর্ণ ছোট্ট বাড়ীতে থাকতো।

মোহসিন অত্যন্ত মনোযোগের সাথে কাজ করতো। হিমাংশু রায় তার প্রতি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। অশোক কুমারের সমান সে মাইনে পেত। তখন অশোকও এই ল্যাবোরেটরীতে কাজ করত। কিন্তু সে আস্তে আস্তে একজন সফল অভিনেতা হয়ে উঠেছিল। তখন আজুরী ও মুমতাজও সেখানে কাজ করত। মিঃ ওয়াচা সাউণ্ড রেকর্ডিস্টের এ্যাসিস্টান্ট ছিলেন—এঁরা সবাই ভদ্রলোক ছিলেন।

প্রতি বছর হোলির সময়ে দারুণ হৈ হল্লা হতো এখানে। একে অপরকে রং ছিটিয়ে দিতো, হাসি তামাসা করতো—অপূর্ব আনন্দ ছিল তখনকার দিনে।

'পুর্নমিলন'-এর শুটিং শুরু হলে হিমাংশু রায় উচ্চ শিক্ষিতা স্নেহপ্রভা প্রধানকে এই ছবির হিরোইন মনোনীত করেন। সে সময়ে খাজা আহমদ আব্বাস সেখানে পাবলিসিটি অফিসারের কাজ করত। মোহসিন ও খাজা উভয়েই সেই মেয়েটির উপর আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। সিন্ধুর মেয়ে স্নেহপ্রভা বোম্বে এসে নাসিং কোর্স

সমাপ্ত করেছিল। মোহসিন ও খাজা উভয়েই আশা করেছিল স্নেহপ্রভা তাদের মনের ব্যথার নার্সিং করুক। কিন্তু সে ছিল অত্যন্ত ধারালো মেয়ে। সে দু'জনকেই ফাঁকি দিতে লাগল।

মোহসিন তার প্রেমে এমন ভাবে হাবুডুবু খেতে লাগল যে, সে ক্রমে জুয়া খেলতে শুরু করল। যা মাইনে পেত তা জুয়া-খেলেই উড়িয়ে দিত। শাহেদা ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাকে প্রতি মাসেই বাড়ী থেকে কিছু না কিছু টাকা আনতে হত। তার একটা ছেলেও ছিল, সে প্রায়ই অসুস্থ থাকত।

শাহেদা একদিন খুব শান্ত গলায় মোহসিনকে বলল ঃ 'মোহসিন, তুমি আমার দিকে নাইবা চাইলে—তোমার সন্তানের দিকে তো নজর দেবে।' মুহসেন একথা শুনে তর্জন গর্জন শুরু করে দিল। কারণ, তার মাথায় তো জুয়া আর স্নেহপ্রভা প্রধানের প্রেমের ভূত সোয়ার হয়ে ছিল।

আমি তখন নানুভাই দেশাই-এর হিন্দুস্থান সিনোটোন স্টুডিওতে চাকুরি করি। শান্তারাম তখন প্রভাত ফিল্ম কোম্পানীতে কয়েকটা হিট ছবি তৈরী করে খ্যাতি লাভ করেছিল—সে আমাকে একদিন আমন্ত্রণ জানালো, তুমি পুনা চলে এসো।

কয়েকজন সাংবাদিক ও কাহিনীকার সেখানে যাচ্ছে। নিমন্ত্রিত-দের মধ্যে ডব্লু জেড আহমদ নামেও একজন ছিল। সম্ভবতঃ সে সাধনা বোসের টীমে কাজ করত। আমার শুধু মনে আছে, ডব্লু জেড আহমদ আমাকে বলেছিল সে বাংলা সংলাপের উর্দু তরজমা করে।

আমরা পুনায় দু'দিন ছিলাম। এ সময়ের মধ্যে আমি তার সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারিনি। কারণ, তার কথাবার্তা, হাসি সবই কৃত্রিম বলে মনে হত। আরেকটা কথা যা আমি নোট করে রেখে-ছিলাম তা হল, সে বিখ্যাত ইহুদী ডাইরেক্টর আর্নেস্ট রোহশনের মত সব সময় মুখে একটা লম্বা চুরুট লাগিয়ে রাখত।

তারপর তার সাথে আমার দেখা হয় অভিনেতা রাম শুক্লের বাড়ীতে। তার ঘরে ঢুকেই আমি দেখলাম, ডব্লু জেড আহমদ ঘরের এক কোনে বসে রাম শুক্লের প্রিয় 'রম' পান করছে।

তার সাথে অভিবাদন বিনিময় হল কিন্ত সেটা নিয়মানুগ। আমি লক্ষ্য করলাম সে কারও সাথে খোলাখুলি আলাপ করতে অভ্যস্ত নয়। সে যেন একটা কচ্ছপ যখন ইচ্ছে তার ঘাড়টা শক্ত খোলসের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। আপনি হাজার চেষ্টায়ও তা বের করাতে পারবেন না।

আমি বললাম, আহমদ সাহেব কিছু কথাবার্তা বলুন। সে তার বিশেষ ভঙ্গিতে হাসলো, 'আপনি তো রামা শুক্লের সাথে কথা বলছেনই। এটাই কি আপনার পক্ষে যথেষ্ঠ নয় ?'

এই জওয়াব শুনে আমার বড়ই খারাপ লাগল। আমার মনে হল, যেন কোন রাজনীতিকের সাথে কথা বলছি। রাজনীতিকদের আমি দারুণ ঘৃণা করি।

এরপর প্রায় দু'বছর অতীত হল, কে যেন আমাকে বলল, ডব্লু জেড আহমদ ফিল্ম কোম্পানী তৈরী করছে। আমি বিস্মিত হলাম, বাংলা সংলাপের উর্দু তরজমাকারী ফিল্ম কোম্পানী করে কি করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তৈরী করল। পুনার এই ফিল্ম কোম্পানীর নাম রাখা হল শালিমার স্টুডিও। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়িও শুরু হল।

এসব বিজ্ঞাপন আমি নিজেও দেখেছিলাম। তাতে বিশেষ করে নীনা নাম্মী এক অভিনেত্রীকে ফলাও করা হচ্ছিল। বিজ্ঞাপনে তাকে রহস্যময়ী বলে উল্লেখ করা হতো। আমি বুঝতে পারতাম না অভিনেত্রীর আবার রহস্য কি থাকতে পারে। যখন সে পর্দায় আসে তখনই তো তার সমস্ত রহস্যজাল খুলে যায়।

কিন্তু দু'বছর ধরে ক্রমাগত এই প্রচারণা চলল। আমি অনেককে জিজ্ঞেস করলাম এই রহস্যময়ী নীনা কে ? কিন্তু কেউ তার সম্বন্ধে কিছুই জানত না।

ফিল্ম ইণ্ডিয়ার এডিটর বাবুরাও প্যাটেল এর সঙ্গে একবার আমার কাজ করবার সুযোগ হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞেস করায় সে বলল ঃ শালা তুমি কিছু জান না, এম্‌নি এডিটর বনে ঘুরে বেড়াও। সেই যে মোহসিন আব্দুল্লাহ আছে তাকে জানো ?

আমি বললাম ঃ নাম শুনেছি, কিছু কিছু তার সম্পর্কে জানিও।

'নীনা হচ্ছে তার স্ত্রী যার আসল নাম শাহেদা।'

আরো জানলাম, শাহেদা রেনুকা দেবীর ভাবী। আমি তাকে বম্বে টকিজের 'ফিল্ম ভাবী'তে দেখেছিলাম নায়িকার ভূমিকায় এবং তার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এখন আমার মস্তিকে দুই ভাবী বাসা বাঁধল। এক বম্বে টকিজের ভাবী দ্বিতীয় শাহেদা ওরফে নীনা অর্থাৎ রেনুকা দেবীর ভাবী।

ডব্লু, জেড আহমদের সাথে আরও কয়েকবার দেখা হয়েছে আমার—আমি দেখলাম, লোকটা খুবই দূরদর্শী।

সে ছিল একজন সংগ্রামী মানুষ। রাশিয়ার লোকদের মত সে কয়েক বৎসরের জন্য স্কীম তৈরী করে এবং অত্যন্ত ধীরে সুস্থে তার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করে।

আমি চঞ্চল প্রকৃতির লোক, তাই স্বাভাবিকভাবেই তার সাথে আমার আলাপ জমে ওঠা সম্ভব ছিল না। আমি হলাম বাচাল আর সে হল গম্ভীর আর তার প্রতি কথাই ছিল কৃত্রিমতায় ভরা। কথা ভালহোক, মন্দ হোক, সব কথাই সে মেপে বলত।

সে বেশ কয়েকটি ভাষা জানত, মারাঠী, গুজরাটি, উর্দু-ইংরাজী ও পাঞ্জাবী। আসলে সে পাঞ্জাবীই ছিল। তার বংশ পরিচয় সম্বন্ধে আমি জানি না, তবে এতটা জানি সে মওলানা সালাইউদ্দিন আহমদের (সম্পাদক আদবী দুনিয়া) ভাই, তার আরেক ভাই রিয়াজ আহমেদ একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী।

মাওলানা সালাউদ্দিন ডব্লু জেড আহমদের ভাই এটা অনেকে স্বীকার করবেন না। কিন্তু একথা সত্যি যে, তারা একে অপরের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতো না। তবে দু'জনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রয়েছে, দু'জনই সমান তোষামোদ প্রিয়।

কিন্তু আমি আরও একটা কথা আপনাদের জানাতে চাই, তা হল, আহমদ (ডব্লু জেড) সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী গোলাম হোসেন হেদায়েতউল্লার মেয়েকে বিয়ে করেছিল। জানিনা সেখানে তার আত্মীয়তা হলো কি সূত্রে।

এই নিবন্ধ লেখার প্রায় ৯মাস আগের কথা। সে হলিউডে চুল কাটাতে এসেছিল তখন আমার সাথে তার দেখা হয়। আমি কাছেই থাকতাম। আমি তাকে জবরদস্তি আমার বাসায় নিয়ে

গেলাম এবং তাকে বললাম, 'আমি নীনা সম্বন্ধে কিছু লিখতে চাই যদি আপনি অনুমতি দেন।'

সে তার স্বভাব সিদ্ধ কায়দায় বলল, 'আমি আপনাকে দু'এক দিনের মধ্যেই জানাব।'

দু' সপ্তাহ কেটে গেল। কিন্তু আহমদের অনুমতি পাওয়া গেল না। আমি ভাবলাম, এত সংকোচের প্রয়োজন কি? প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী তো লেখক লেখিকারদেরই সম্পত্তি। যদি তুমি তাদের সম্বন্ধে কিছু লিখতে চাও, বিনা অনুমতিতেই লিখতে পার।

এ কারণেই আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করছি।

শালিমার স্টুডিও প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। নীনা অর্থাৎ শাহেদার স্বামীকে সেখানকার ল্যাবোরেটরীর ইনচার্জ করে দেওয়া হল। এখন আমার যতদুর জানা আছে আপনাদের তা লিখে জানাচ্ছি।

এদিকে মোহসিন তো স্নেহপ্রভা প্রধানের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। যখন অর্থাভাব দেখা দিল তখন শাহেদাকে বলল, 'তুমি বড্ডো ব্যাকওয়ার্ড—দেখতো আমার বোনদের, তারা কেমন ফরোয়ার্ড।'

শাহেদা সম্ভবত বলেছিল: 'আমায় ক্ষমা কর অতটা আধুনিকা আমি হতে পারব না।'

কয়েকবার তাদের মধ্যে ঝগড়াও হয়েছিল। মোহসিন চাচ্ছিল সে ফিল্মে নামুক কিন্তু তার এদিকে মাত্রও আকর্ষণ ছিল না।

ইসমত চুখতাই (জিদ্দী আরজু ও বুজদিলের মত কয়েকটি হিট ছবির গল্প লিখেছিল) আমার স্ত্রীকে বলল, আলীগড়ে শাহেদা তার সহপাঠিনী ছিল, বড়ই বোকা আর সরল গোছের মেয়ে।'

"আমার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?" আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস করল।

ইসমত জওয়াব দিল: "তুমি তো ধারালো কথা বলার মেয়ে (মুখরা)।"

"এতে আর দোষের কি?"

"কোন দোষ নাই—কিন্তু শাহেদা আর তোমাতে পার্থক্য অনেক।"

"কোন দিক দিয়ে?"

'তুমি তোমার স্বামীকে সামলাতে পার, সে তার স্বামীকে সামলাতে জানে না।'

"এ কথা তুমি কি করে জানলে ?"

"আমি তো আগেই বলছি, ওকে আমি ভাল করে জানি। তাদের পরিবারের সবাইকে জানি। একেবারে হাবামেয়ে ছিল। আমরা কলেজে তাকে নিয়ে তামাশা করতাম। সে খুবই লজ্জা পেত।"

ইসমত আমার স্ত্রীকে জানায়, তার প্রেম সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। অথচ সে কেমন করে মোহসিন আব্দুল্লার প্রেমে আটকা পড়ে গেল। তার মন ছিল খুবই নরম—তাই একথা চিন্তা করেনি ভবিষ্যতে কি হবে।

আমি জানতে পারলাম শেষ পর্যন্ত মোহসিন শাহেদাকে বাধ্য করল যাতে সে ছবিতে নামে। সুতরাং তার নামের ওপর শালিমার স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করা হল এবং আহমদ (ডব্লু জেড) একজন প্রডিউসর বনে গেল আর শাহেদাকে রহস্যময়ী নীনায় রূপান্তরিত করে ফেলল।

জানিনা, এ নামটা তার স্বামীই তার জন্য দিয়েছিল, না ডব্লু জেড আহমদ দিয়েছিল।

এই কোম্পানীর প্রথম ছবির নাম ছিল 'একরাত'। জানি না এজন্য কত রাত কেটেছে। যাই হোক, ছবি তৈরী হয়ে গেল।

এই ছবির কাহিনী গলসওয়ার্দীর বিখ্যাত উপন্যাস 'টিস' অবলম্বনে রচিত। এতে শাহেদাকে (রহস্যময়ী নীনা) এক গোয়ালিনীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। একব্যাক্তি তার ওপর বলৎকার করে। তারপর নিয়ম অনুযায়ী তার বিয়ে হয়ে গেল। সে অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মেয়ে ছিল। তার স্বামীকে তার অতীত জীবনের কাহিনী শুনালো একদিন। যার ফলে সে স্বামী-গৃহ হতে বিতাড়িত হল।

আহমদ (ডব্লু জেড) তার পাঁচশালা পরিকল্পনার কর্মসূচী অনুযায়ী শাহেদার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করত।

শাহেদার স্বামী মোহসিন তার নিজের ব্যস্ততা নিয়েই থাকত। ওদিক স্নেহপ্রভার সাথে তার ব্যর্থ প্রেম পূর্ববৎ চলছিলই। শাহেদার প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল না।

আহমদ যখন এভাবে মোহসিনের বন্ধু হয়ে গেল তখন শাহেদাকে বেগম বলত। তাকে প্রয়োজনতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করত। সে এলে দাঁড়াত এবং সালাম জানাত। সে মহসিনের অবহেলার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল।

কিন্তু সে জানত (সে বড়ই পরিণামদর্শী ছিল) শাহেদাকে দু' এক বছরে না হলেও পাঁচ বছরে সে নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে।

এখানে একটা কথা বলে রাখি, সিনেমা জগতে প্রায় এবং অধিকাংশ লোকই মেয়েদের মারফতই সাফল্য অর্জন করে থাকে। আহমদ তাকে প্রভাবিত করবার জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করল। তার স্বামী মোহসিন আব্দুল্লাকে সকল দিক থেকে খুশী রাখবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার স্বভাবই ছিল ছন্নছাড়া।

শাহেদা যদিও অভিনেত্রী হয়ে গেল তাকে এমন একটা গোয়ালিনীর রোলে অভিনয় করতে হবে যার সতীত্ব অপহৃত হয়েছে কিন্তু সে তার স্বামীকে ভালবাসত, সে চাইত শেষে সিনেমা জগত ছেড়ে সংসার ধর্ম পালন করবে। রহস্যময়ী উপাধিতে ভূষিত হওয়া তার মোটেও ভাল লাগত না।

কিন্তু যখন তার নামে দু' বছর ধরে প্রচারণা চলল তখন তার ছোট্ট খেলাঘরে (যাকে অন্তর বলা হয়) সেখানে এক বৈচিত্রময় স্পন্দন শুরু হল যা সে আগে জানত না।

আহমদ তাকে যে মর্য্যাদা দিয়েছিল সে সম্বন্ধে সে চিন্তা করতে লাগল। সে ছিল ভদ্রতার প্রতীক। তার তুলনায় মোহসিন ছিল দারুণ অভদ্র, অশিক্ষিত। সে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত, এ ছাড়াও শাহেদার অনুযোগ ছিল সে স্টুডিওতে অন্য মেয়েদের সাথেও প্রেম করে বেড়ায়।

মোহসীন কেন জুয়া খেলে, কেন রেসে টাকা হারে, কেন স্টুডিওর মেয়েদের সাথে ফষ্টি নষ্টি করে তা সে কোনদিন জিজ্ঞেস করতোনা। কেননা সে চাইতো সে আরও ভালো করে এই সব খারাপ কাজে ডুবে থাকুক। কারণ সে নিজেও তার চেয়ে আরেকটা ভারি রকমের খারাপ কাজ করতে উদ্যত হয়েছে।

আহমদ একজন ভালো স্থপতি। সে নিজের কাজ অত্যন্ত ধীরে অথচ অত্যন্ত সাফাই-এর সাথে করে গেল। অবশেষে সে

তার প্রাসাদ থেকে মোহসিন নামক ইটটা বাদ দিতে সক্ষম হলো।

সে এই সময়ের মধ্যে শাহেদার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দিতে পেরেছে যে, তার স্বামী মোহসিন একটা ছন্নছাড়া অকর্মন্য লোক। সে তাকে শুধু এজন্যই নিজের কারবারে নিয়োগ করে ছিল যেন তার স্বভাবটা শুধরে যায়। কিন্তু সে তার যোগ্য নয়।

শাহেদা এসব কথা শুনত এবং কখনও এসব তার কাছে সত্যি বলে মনে হত না। ল্যাবোরেটরীর কাজ খুব ঢিমে তালে চলছিল। আহমদ নিজেও পিপড়ের গতিতে চলতে অভ্যস্ত ছিল।

কিন্তু তবু সে একদিন মোহসিনকে খুব নরম সুরে বলল: দেখুন, একাজ আপনাকে দিয়ে হবে না। সম্ভবতঃ এটা আপনার যোগ্য কাজ নয়। তাই আমি ল্যাবোরেটরীতে অন্য লোক রাখছি। তবে যে মাইনে আপনার নির্দ্দিষ্ট আছে—তা বরাবর পেয়ে যাবেন।

মোহসিন প্রথমে তো খুবই রেগে গেল। এই আগুন আহমেদ সহজেই নিভিয়ে ফেলল অর্থাৎ মোহসিনের চাকুরীটা গেল। সে এখন থেকে পেনশন পেতে লাগল।

তখন হয়তো সে একথা ভুলে গেছল যে, তার স্ত্রী যাকে সে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এসেছে এবং যাকে সে বাধ্য করেছে তার বোনদের মতো "স্বাধীন জেনানা" হতে তার সিঁথিতে অপর কেউ আস্তে আস্তে সিদুর লাগাচ্ছে। সে একেবারেই গ্রাহ্য করত না এ দিকে তার স্ত্রীর প্রতি মোটেও আকর্ষণ ছিল না। তার মন পড়ে থাকত বোম্বে ও পুনার রেসকোসের ঘোড়ার ওপর—তাসের ওপর কিংবা পুণার ফটকা বাজারের ওপর।

ফিল্ম তৈরী হচ্ছিল শাহেদা গোয়ালিনীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য সারা দিন ব্যস্ত থাকত ওদিকে, আহমদ ডাইরেক্টর হিসাবে এমন ভাবে ডাইরেকশন দিচ্ছিল যাতে তার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।

মোহসিন আবদুল্লাহ বিরাটদেহী ছিল। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, শক্ত দেহ, শিক্ষিত। কিন্তু প্রয়োজনতিরিক্ত আধুনিকমনা। সে শালিমার স্টুডিওর চাকরী ছেড়ে দিল; কিন্তু তার স্ত্রীর বিচ্ছেদের (যাকে সে প্রেম করে বিয়ে করেছিল) প্রতি মাত্রও খেয়াল করলো না। সে শাহেদাকে পুরো পুরি বিশ্বাস করত কিন্তু

তা সত্ত্বেও সে তার প্রতি মাত্রও মনোযোগ দিল না। সে এমন মুক্ত পুরুষ হয়ে গেল এবং মুক্তির স্বাদ ভোগ করবার জন্য পুরোপুরি ভাবে কাজে লেগে গেল।

ওস্তু জেড আহমদ বড়ই বিবেচক লোক ছিল। সে তার অধীনে চাকুরীরত অপর লোকদের সময় মত মাইনে না দিতে পারলেও মোহসিনের পেনশন ঠিক সময়ে দিয়ে দিত, এটা তার একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সে ছেকঁড়া বা ইতর লোক ছিল না। একটা সম্ভ্রান্ত বংশের সমস্ত গুণাবলীই তার চরিত্রে বিদ্যমান ছিল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সিনেমা জগতে এসে পড়েছিল, নয়তো সে রাজনৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিল। সে জন্যই এই পরিবেশ অনুযায়ী তার চরিত্রকে গঠন করতে হয়েছিল। তার নিজের কোন মূলধন ছিলনা, তবু সে লাখ লাখ টাকা রোজগার করতে সক্ষম হয়। সে টাকা সে বিলাসিতায় উড়িয়ে দেয়নি। আসলে সে ছিল একজন চতুর লোক এবং দ্রুত গতিসম্পন্ন—এ ছাড়া তোষামোদ প্রিয়ও বটে। অর্থাৎ সে একটা ক্ষুদে মোগল বাদশাহ ছিল—তাই সে তার চার পাশে কবি, ভাঁড় এবং এ ধরনের লোকদের অবস্থান পছন্দ করত।

তার কাছে সাগির নিজামী, জোশ মালিহাবাদী, জান নিশার আখতার, কৃষণ, চুখতাই এবং আমার ভাগ্নে মাসউদ পারভেজও চাকরী করত। এরা জেড আহমদের বাড়ীর একটা কামরায় জমায়েত হতো। গল্পের সংলাপ নিয়ে গরমা গরম বির্তক হতো। সারা রাত কেটে যেত, কিন্তু কোনই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেত না। কারণ এটা ছিল মোগলাই দরবারের পরিবেশ। কোন কথা নিয়ে আলোচনা চলছে তো জোশ সাহেব সুযোগ-সুবিধামত কবিতা পড়তে শুরু করতেন। সবাই বাহবা দিয়ে উঠত। মাসউদ পারভেজ—যার মস্তিষ্ক তখন খুব ধারালো ছিল, তখনই সেই বিষয়বস্তু নিয়ে কয়েকটি কবিতা রচনা করে ফেলতো। সাগির নিজামীর যখন মেজাজ গরম হয়ে উঠল তখন তিনিও লম্বা-চওড়া দরদ ভরা একটা কবিতা পাঠ করলেন। কৃষণ চন্দর বোকার মত বসে থাকতো। কারণ, সে হল গল্প লেখক কবিতার সঙ্গে তার কিইবা সম্পর্ক।

এসব বৈঠকে কাজ খুব কম হত—কথাই হত বেশী। ভরত ব্যাসের হীনমন্যতা ছিল। কারণ সে উর্দু জানতোনা—তাই সে সংস্কৃতি মেশানো হিন্দীর ফোঁড়ন দিত।

কখনও আহমদও দু'-একটা কবিতার লাইন বলত আর অমনি জোশ মালিহাবাদী বাহবা দিয়ে উঠতেন। আহমদ সাহেব আপনিতো আসলে একজন কবি। আহমদ তখনই তার কাজ কাম ভুলে যেত। দরবার সে দিনের মত শেষ হয়ে যেত। আহমদ কবিতা লিখতে শুরু করত সারা রাত জেগে এবং আমি যতদুর জানি, আজ পর্য্যন্ত তার একটা কবিতাও পুরো হয়নি।

এরা সবাই ছিল আহমদের চাটুকার। জোশ মালিহাবাদী তার বরাদ্দ আধা বোতল রম খেতেন রোজ সন্ধ্যে বেলা। প্রথমদিকে স্টুডিওতে নিয়মমত মাইনে কড়ি পাওয়া যেত—তার পরই অনিয়ম শুরু হয়ে গেল। কর্মচারীরা শুধু এ্যাডভান্স নিত।

সেখানকার পরিবেশই ছিল বিচিত্র ধরণের, ডাইরেক্টর ছিল মোটে একজন কিন্তু তার এসিস্ট্যেন্ট ছিল দশবারোজন। এছাড়া এসিস্ট্যেন্ট তথ্য এসিস্ট্যেন্টও। জানি না এদের চলত কি করে। কেননা মাইনে তো সময় মতো পাওয়া যেত না।

সে যাই হোক—এ হল আহমদের মেজাজ। চরম বিপদের সময় ও সে বিচলিত হত না। বেশ ধীরে সুস্থে রূপোর কৌটা খুলে পান বের করবে, তার পর থলি থেকে সুপরী আর জর্দা বের করে মুখে পুরে মিটমিট করে হাসতে থাকতো।

একজন ঝানু রাজনীতিকের মধ্যে যে সব গুনাবলী থাকা দরকার তা তার মধ্যে পুরোপুরিই ছিল। এই গুণের জন্যই সে শালিমার স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করল, এবং পা মেপে মেপে শাহেদাকে হাতিয়ে নিল। আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি সে শাহেদার মধ্যে এমন কি গুণপনা লক্ষ্য করল, যার সাদাসিদে দেহের উপর একটা চিত্রশালা নির্মাণ করা সম্ভব হল। হয়তো আহমদের হাতে তখন আর কোন মেয়ে ছিলনা—তাই সে তার বন্ধু মোহসিন আব্দুল্লার বউকে দিয়েই কাজ বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল এবং পরে তার গৃহিনী সুলভ মন দেখে হয়তো প্রভাবিত হয়ে তাকে ভালোবাসতে শুরু করেছিল।

কিন্তু এতেও সন্দেহের অবকাশ থাকে। শাহেদাকে আহমদ ভাল নাও বাসতে পারে—সে শুধু তার লাভের জন্যই শাহেদার প্রতি একের পর এক ভদ্রতার বোঝা চাপিয়ে যেতে থাকে যার ফলে শাহেদা তার স্বামীকে ভুলতে শুরু করে। কিন্তু এ অনুমানও ঠিক নয়।—কেননা শাহেদা তার স্বামী থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে রাজি ছিলনা। এ সম্বন্ধে পরে বলছি। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি শাহেদা আহমদের সাথে কেন থাকে। একটু ধৈর্য্য ধরুন, আমি ভুলে যাচ্ছি—আগে তারা আলাদা বাড়ীতে থাকত। কিন্তু পরে একই বাড়ীতে বাস করতে লাগল।

এটা কোন সময়ের কথা—তা আমার মনে নেই। আমি তখন ফিল্মিস্তানে চাকুরী করি। এস, মুখার্জী সেখানকার প্রোডাকশন কন্টোলার ছিলেন। তিনি একদিন আমাকে বললেন, তুমি গল্প লিখছ না কেন? আমি তখন পাঁচদিনে চারটি গল্প লিখে ফেললাম। মুখার্জী আমাকে গল্প শোনাতে বললেন। কিন্তু আমি তাকে গল্প শোনালাম না এবং গল্পগুলো আমার ভাগ্নে মাসউদ পরভেজকে পাঠিয়ে দিলাম, সে তখন শালিমার স্টুডিওতে কাজ করত।

প্রথম গল্প ছিল 'কন্টোলস্তান। চতুর্থ দিনে আমি মাসউদের তার পেলাম তোমার গল্প মনোনীত হয়েছে, সুতরাং পুনা চলে এস।

আমি পুনা গেলাম। এখানে একটা মজার কথা বলে নিই, প্রথমে আমি স্টুডিওর 'মুতরী' (ল্যাট্রিন)-তে গেলাম। কেননা, এটা এমন একটা স্থান যেখান থেকে সংশ্লিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সম্পর্কে বেশীর ভাগ অবস্থা অবগত হওয়া যায়।

আমি যখন ভেতরে গেলাম তখন সামনের দেওয়ালে উর্দুতে লেখা দেখলাম; 'এখানকার সব কিছুই ঠিক আছে—তবে মাইনে ঠিকমত পাওয়া যায় না।' আমার মন খারাপ হয়ে গেল। মনে করলাম ফিরে যাই, কিন্তু মাসউদ আমাকে ছাড়ল না। সে বলল, আহমদের সাথে দেখা করে যাও। সন্ধ্যায় তার সাথে দেখা হল। সে অফিসে—ইয়া বড় একটা চুরুট মুখে নিয়ে বসেছিল। এক পাশে শাহেদা—অপর দিকে জোশ মালিহাবাদী।

জোশের সাথে সালাম আলেকুম বিনিময় হল। তার পাশে ছিপি বন্ধ হাফ বোতল 'রম' ছিল। কিন্তু পরক্ষনেই মনে হল,

জোশ এবং শাহেদা এখানে বসে আছে, তাই উর্দুতে বলতে লাগলাম।

আমি আহমদকে যখন প্রভাত ফিল্ম কোম্পানীতে দেখেছিলাম তখন সে বেশ সতেজ যুবক ছিল। কিন্তু এখন তার বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। মনে হচ্ছিল 'লু' হাওয়া চলার দরুণ তার গায়ের চামড়া ধুসর হয়ে গেছে। সে তার বিশিষ্ট ভঙ্গি নিয়ে আমার সাথে করমর্দন করল। এবং শাহেদা ওরফে রহস্যময়ী নীনার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিল।

তার চেহারায় এমন কোন বস্তু ছিলনা—যা দেখে মনে হবে তার মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। অতি সাধারণ গড়নের একটা মেয়ে মানুষ আমি তাকে প্রথমে যখন দেখি তখন মনে হল যেন জলরঙের একটা ছবি, ফুটো ছাদ দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে তার আসল রংটা হারিয়ে ফেলেছে।

তার মধ্যে অভিনেত্রী সুলভ কোন বৈশিষ্টই ছিল না। চুপচাপ সে একটা চেয়ারে বসেছিল। সে জানতো আমি কে এবং এ কথাও জানত আমি তার স্বামী মোহসিন আব্দুল্লাহকে ভালো করে জানি।

আমি যে গল্প বিক্রির জন্যে গেছলাম সে সম্পর্কে সেদিন কোন কথাই হল না। তবে আমি রহস্যময়ী নীনাকে দেখে নিয়েছিলাম।

আমি মোহসিন আব্দুল্লাহকে ফিল্মিস্তানে চাকুরী দিয়েছিলাম। তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। একদিন আমি প্রোডাকশন কন্টোলার মিঃ মুখার্জীকে বললাম বোম্বে টকিজের আমলে সে তার বন্ধু ছিলো এখন তার এই বিপদের দিনে খোঁজ নেয়া অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার।

মুখার্জী পরদিনই তাকে ডেকে পাঠালেন। পরস্পর বন্ধুসুলভ আলাপ হল। ফিল্মিস্তানে কাজ করতে সে রাজি হয়ে গেল। চারশ' টাকা মাইনে ধার্য্য করা হল তার।

মোহসিন আব্দুল্লাহ বড়ই কামচোর। কোন কাজ করবার অভ্যাসই ছিল না তার। আমার মনে হয়, সে মনে করত অপরে রোজগার করুক আর সে বসে বসে খাক।

তখন 'আটদিন' নামে একটা ছবি তৈরী হচ্ছিল। কাহিনী আমার লেখা। আমি যখন তার পটভূমি লিখি তখন মোহসিন

আমার খুব উপকার করেছিল। সে কয়েকটা উপদেশ দেয়—যা চিত্রশিল্পের দৃষ্টিকোন থেকে একেবারে ভুল। আমি তার উপদেশ এড়িয়ে গেলাম।

তখন সে একবার বলেছিল শাহেদার ভালবাসা তাকে এখন মাঝে মধ্যে পীড়া দেয়। যদিও আমি জানতাম সে একটি মেয়ে যার নাম ভীরা এবং তাকে আমরা 'আটদিনের' হিরোইন নির্ধারিত করেছিলাম —তার পেছনে ধাওয়া করছে।

প্রথম দিকে সে সেকেণ্ড ক্লাশে ভ্রমন করতো। ফিল্মিস্তান স্টুডিও শহর থেকে অনেক দুরে। প্রায় ১৯ মাইল হবে।

এত দুরত্ব অতিক্রম করতে প্রায় কমসে কম পৌনে এক ঘন্টা লাগত। কিন্তু রায়বাহাদুর চুনীলাল যখন 'আটদিনে'র জন্য ভীরার সাথে চুক্তি করলেন তখন থেকে সে (মোহসিন) ফাষ্ট ক্লাশে যাওয়াত করত।

আমি আহমদের অফিসে বসে একটা স্ক্রিপ্ট দেখছিলাম। তার পাশে রহস্যময়ী নীনাও ছিল; কিন্তু আমার চোখে তাদের মধ্যে কোন 'মিসরীয়ত্ব' ছিল না।

একে তো রহস্যময়ী নীনা আমার কাছে একেবারে অপরিচিতা ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হল, যেন আমি তাকে তার জন্মলগ্ন থেকেই জানি। যেমন আমি আগে বলেছি সে একেবারে সংসারী মেয়ে ছিল এবং দেখেও তাই মনে হত।

আমার মনে ও মস্তিস্কে অসংখ্য চিন্তা কিলবিল করছিল। কেননা, আমি তো মোহসিন আবদুল্লাহকে বন্ধু বলে গ্রহন করেছি। সে যেমন অকপটে তার জীবন কাহিনী আমাকে শোনালো তা আমার মনে দাগ কাটতে সমর্থ হল। সে আমাকে বলেছিল, তার স্ত্রী শাহেদাকে তার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি একথা বুঝতে পারলাম না কোন স্বামীর উপস্থিতিতে তার স্ত্রীকে কেমন করে জোর কেড়ে নেয়া সম্ভব?

সে তার স্ত্রীকে নিয়ে সব সময় অনুযোগ করত সে তার বোনদের মত আধুনিকা নয়। সে বেচারী সিনেমা জগতের সাথে পরিচিত হতে মাত্রও আগ্রহী ছিল না। অন্তরে সে জ্বলেপুড়ে মরত তার স্বামী নিজে ফিল্ম কোম্পানীর ল্যাবোরেটরীতে কাজ করত, কেন তাকে আবার সিনেমায় নামাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

শাহেদা যে এক সম্ভ্রান্ত আধুনিক শিক্ষিতা মেয়ে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মধ্যে লজ্জা নামক ভূষণটা বজায় ছিল। প্রথমে সে তার স্বামীর কাছে অনুযোগ করত কেন সে অন্য অভিনেত্রীদের সাথে প্রেম করে। কিন্তু মোহসিন তার স্ত্রীর কোন কথাই শুনতোনা।

মোহসিন মিস প্রধানের ফাঁদে পড়ে ঘুরছিল। আমি আপনাদের একটা কথা বলে রাখি, মিস প্রধান অত্যন্ত স্থির বুদ্ধির মেয়ে ছিল। মোহসিন তার স্ত্রীকে একরকম ত্যাগই করেছিল, তার সম্বন্ধে তার কি ধারণা জন্মাতে পারে? ফলে, তাদের রোমান্সের পরিণতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

আমি যখন আহমদের অফিসে নীনাকে প্রথম দেখি, তখন অভ্যাস মত মদ পান করে ছিলাম—আর মদ টানবার পর আমার মনে কোন দ্বিধা সংকোচ থাকে না। সুতরাং আমি রহস্যময়ী নীনাকে বলে ফেললাম আপনার রহস্য সম্বন্ধে তো আমি কিছুই জানিনে—সে রহস্য তো জেড আহমদের কাছে সংরক্ষিত আছে। তবে এতটুকু জানি যে, আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।

একথা শুনে ডক্টর জেড আহমদ আমার দিকে চেয়ে দেখল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল তাকে একটু বাইরে যেতে হচ্ছে একজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য। একথা বলেই সে চলে গেল এবং যাবার সময় জোশ মালিহাদীকেও সঙ্গে নিয়ে গেল। এসব ব্যাপারে ডক্টর জেড আহমদের কোন জুড়ি নেই। সে প্রতিটি ইসারা-ও ভঙ্গী এক মুহূর্তে ধরতে পারে। এই কারণেই সে তার পাঁচশালা পরিকল্পনার মাধ্যমে নীনাকে লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। যাকে সে রহস্যময়ী বলে বেড়াচ্ছিল। আসলে রহস্য হল আহমদের সে নীনাকে একটা নোটন কবুতরীর মতো করে রেখেছিল যে, শুধু তার ঘরেই ডিম পারবে।

আহমদের প্রস্থানের পর আমি নীনার সঙ্গে আলাপ শুরু করলাম। আমি তাকে বললাম তোমার স্বামী তোমার জন্য এখনও কেঁদে মরছে। একথা শুনেই তার মনি ঠোঁটে এক অদ্ভুত ধরণের অজ্ঞতার হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, "মান্টো সাহেব, আপনি জানেন না, তার প্রতিটি অশ্রুবিন্দু প্রবাদের 'কুম্ভীরাশ্রু ছাড়া কিছু নয়। সে নিজে কাঁদে না—কান্নাই তাকে কাঁদায়।"

একথা আমি বুঝতে পারলাম না। যাই হোক শাহেদা ও রফে রহস্যময়ী নীনার রহস্যহীন গাম্ভীর্য্য দেখে প্রতীয়মান হল সে যা বলেছে তার মধ্যে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। তখন 'মীরা-বাই' এর প্রস্তুতি পর্ব চলছিল। তাছাড়া 'কৃষ্ণ ভগবান' তৈরীর জন্যও আহমদ ভারতভূষণকে চুক্তিবদ্ধ করেছিল, যাতে সে কৃষ্ণ ভগবানের ভূমিকায় অভিনয় করে।

ভারত ভূষনকে নিয়মিত মাখন ও অন্যান্য পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করানো হত। কারন সে খুব রোগা পটকা ছিল।

ভারতভূষণকে প্রতিদিন নিয়মিত মাখন খাওয়ানোর সাথে আহমদ শাহেদার রহস্য আরো বাড়িয়ে তুলল, যা তার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এখন আমি আহমদের বিবাহিত পত্নীর কথা বলি। যার নাম ছিল সুফিয়া। সে মরহুম গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লাহ্ (সিন্ধুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর) মেয়ে।

স্বামী যখন অপর মেয়ের পেছনে ধাওয়া করে তখন তার স্ত্রী, যে শিক্ষিতা ও আধুনিকা—নিশ্চয়ই কোন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে। এখানেও তাই হল, বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতা সিব্‌তে হাসানের সাথে তার প্রেম চলতে লাগল।

এই রোমান্সটা সম্বন্ধে আমি পুরোপরি জ্ঞাত ছিলাম না, এ জন্য আমি লাহোরে গিয়ে সিব্‌তে হাসানের সঙ্গে সাক্ষাত করি। কিন্তু খোলাখুলি ভাবে কথা বলতে পারিনি। রোজই মনে করতাম যে, এবার যখন দেখা হবে তখন আহমদের স্ত্রীর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করব। কি করে তাদের এ সম্পর্ক গড়ে উঠল। কেননা আমি শুনেছিলাম সুফিয়া উচ্চশিক্ষিতা, আমেরিকায় কোন শিক্ষা সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছিল এবং সিবতে হাসানও তার পিছনে আমেরিকায় চলল। সেখানেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

এ-প্রবন্ধ আমি নিশ্চয়ই শেষ করতাম, কিন্তু সরকারী শাসন-যন্ত্র হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠল এবং সিব্‌তে হাসান আকস্মাৎ গ্রেফতার হয়ে গেল। কারণ সে একজন কম্যুনিষ্ট ছিল।

গ্রেফতার হওয়ার আগের সন্ধ্যায় তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। সে পাইপে দুনিয়ার ধুলো-বালি মাখানো তামাক ভরে

ফুঁকছিল। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, জিজ্ঞেস করি আহমদের প্রাক্তন স্ত্রী সুফিয়ার সাথে কি করে তার ভালবাসা হল, সে এখন কোথায়? কারণ, তিন বছর জেলে থাকার পর সিব্‌তে হাসান ছাড়া পেয়েছিল।

আহমদ ও সিব্‌তে হাসানের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। আহমদ রাজনীতিক আর সিব্‌তে হাসান ভাব প্রবণ অর্থাৎ একেবারে বিপরীত। তার এসব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পোষায় না। যা করার হুটকরে করে ফেলতে চায়।

এমনিতে তাকে দেখে মনে হয়, সে খুবই নিরস কিন্তু ভেতর থেকে খুবই কোমল মানুষ ছিল।

গ্রেফতার হওয়ার কয়েকদিন আগে সে আমার বাসায় বসেছিল। বিপদ হল এই যে, আমার আরও কয়েকজন বন্ধু সেখানে ছিলেন। তাদের উপস্থিতিতে তার সাথে খোলাখুলি আলাপ করা সম্ভব নয়। কথায় কথায় আমি তাকে বললাম, বলুন, আবার কবে জেলে যাবেন?

সিব্‌তে হাসান পাইপে একটা সুখটান দিয়ে বলল, 'এই কয়েক দিনের মধ্যেই।'

আর সত্যি সত্যি দিন পনের পরই তাকে ধরে জেলে ভরা হল। তাই আমাকে এই প্রসঙ্গ অসমাপ্ত রাখতে হল।

শাহেদার (নীনা) স্বামী মোহসিন একটা বিপজ্জনক মেয়ে—স্নেহ-প্রভা প্রধানের সাথে প্রেম করছিল। তার স্ত্রীর ওপর আহমদ সাহেব ধীরে সুস্থে অত্যন্ত কৌশলের সাথে ডোর ফেলছিল।

এদিকে-ওদিকে আরও অনেক কিছু হচ্ছিল। কে এক মিসেস নূরানী ছিল, এক পাঞ্জাবী ছোকড়া তার প্রেমে উন্মাদ হয়ে পড়ল। আহমদ মিঃ অথবা মিসেস নূরানীর আত্মীয় ছিল। সে যাই হোক, আমি তাকে কয়েকবার তার বাসায় ফোর্জেট স্ট্রীটে দেখেছি।

সে পাঞ্জাবী ছোকড়াটাও ছিল অদ্ভুত ধরণের, জানি না তার কোন রোগ ছিল কিনা। থেকে থেকেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ত।

মিঃ নূরানী চুরুট মুখে চেয়ারে বসে থাকতেন, চুপকরে। আর তার স্ত্রী পাঞ্জাবী ছোকড়াকে তার সমনেই মুখে তুলে খাওয়াতেন। কখনও চুম্বন আলিঙ্গনও হয়ে যেত।

এ এক বিচিত্র ধারা। মোহসিন স্নেহ প্রভা প্রধানের সাথে প্রেম করে তার বউকে আহমদ ভাগিয়ে নেয় ওদিকে আহমদের

স্ত্রী সুফিয়া সিব্‌তে হাসানের সাথে প্রেম করে। আর তাদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে এই একই ধারা চলে আসছিল।

এসব দেখে আমি ভয়ে আৎকে উঠলাম—এসব কি ব্যাপার।

আমার ধারণায় দুনিয়ায় এ ধরণের ঘটনার কোন অভাব নেই। স্ত্রী ও পুরুষ—সবাই এই বিকল্প পথে যাতায়াত করতে চায়।

এখানে এটাও প্রানিধানযোগ্য যে, যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে অবহেলা উপেক্ষা করে পরকীয়া প্রেমে মজে, তার ফল সে একদিন পাবেই।

পুনাতে আহমদ ও নীনা (শাহেদা) এক সঙ্গেই থাকত। একটা সুন্দর বাংলো ছিল তার; আহমদ খুব কম সময়ই সেখানে যেতো। বেগম সাহেবার কুশল জিজ্ঞেস করেই চলে যেত।

আস্তে আস্তে সে নীনার ওখানেই স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগল। এখন তারা সকালে একসাথে নাশতা করে, দুপুরে এক সাথে লাঞ্চ খায় এবং সন্ধ্যায় এক সাথেই ডিনার খায়।

স্টুডিওয় তো প্রায় সময়ই দু'জনকে একই সঙ্গে থাকতে হত; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই সময়ের মধ্যে আহমদের আচরণে এমন কোন ভাব দেখা যায়নি যে, সে শাহেদাকে পেতে চায়।

শাহেদার স্বামী মোহসিনকে আহমদ তখন কৌশলে বের-করে দিয়েছে সে তা টেরও পায়নি। আজ মোহসিন বোম্বাই এর পথে পথে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন সে তার স্ত্রীর দৌলতে পুনা থেকে বোম্বাই পর্য্যন্ত মোটরে এসেছে। কিন্তু সে আজ তাকে আর লিফট দেয় না।

আমি একদিন ট্যাক্সীতে করে লিমিরটন রোড দিয়ে যেতে মোহসিনকে দেখলাম। ট্যাক্সী থামিয়ে আমি তার কুশল জিজ্ঞেস করলাম। 'মোহসিন সাহেব, আজ কাল কোথায় থাকেন আপনি?'

তার বিরাট মুখ এক বিচিত্র হাসিতে ভরে উঠল: আজ কাল আমার কাজ হচ্ছে রাস্তা মেপে বেড়ানো।

আমি ও বিদ্রুপের সুরে পালটা প্রশ্ন করলাম: বলুন তো এই রোড কতটা লম্বা আর কতটা চওড়া?

সেও ঠিক সেই সুরেই জওয়াব দিল: আপনার মত লম্বা আর আমার মতো চওড়া।

আমি তাকে বললাম ঃ আসুন আমার গাড়ীতে। যেখানে যেতে চান, সেখানে নামিয়ে দেব।' কিন্তু সে আমার এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করল না। তাকে অত্যন্ত পীড়িত বলে মনে হচ্ছিল।

তার এ পীড়ার কারণও ছিল কয়েকটি। একেতো সে তার স্ত্রীকে হারিয়েছিল, স্নেহপ্রভা প্রধান তার সাথে ভাল ব্যবহার করছিল না। তা ছাড়া জুয়া খেলে তার পুঁজি শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তখন কোন চাকুরীও ছিল না যার আশ্রয়ে সে দাঁড়াতে পারে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বলুন তো মিস প্রধানের খবর কি?

সে বিষাক্ত হাসি হেসে জওয়াব দিল, ঠিকই আছে। তবে এখন খাজা আহমদ আব্বাস তার সাথে প্রেম করছে।

আবার একটু পরে হেসে বলল ঃ দু'তিন মাসের মধ্যেই টাক পড়বে মাথায়।

আমি বললাম ঃ সে মেয়েকে আপনি জানেন না তো—সে মেয়ে নয়, সেফটি রেজর। আর তাও এমনি যে, তা দিয়ে মাথা কামালে আর কোন দিনই মাথায় চুল গজাবে না।

দেখা গেল, খাজার মাথায় টাক পড়ে গেল—আর মোহসিনেরও অনেক কাল পরে টাক পড়তে শুরু করল। অনেক কাল পরে যখন আমি ফিল্মিস্তানে গল্প ও পটভূমি লেখক হিসেবে চাকুরী নেই তখন মোহসিনের সাথে আমার আবার দেখা হল। তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। আমি জানতাম সে মিঃ এস মুখার্জীর বন্ধু। কারণ উভয়েই একসাথে বোম্বেটকিজে কাজ করেছে।

আহমদের সাথে বোম্বে টকিজের কোন সম্পর্কে ছিলনা। জানিনে কি করত সে সেখানে। ওখান থেকে বের হয়ে সে নিজেই কোম্পানী খুলে বসল এবং নিজেই কর্তা বনে গেল।

যাক, আগেই আমি বলেছি জেড আহমদ ছিল অত্যন্ত চতুর ও প্রতিভাবান লোক। সে বড় বড় মারোয়াড়ীদের এমন ভাবে ঠকিয়েছিল তারা তা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি।

তিন গুলি : বিন্দু থেকে বৃত্ত

হাসান বিল্ডিং-এর এক নম্বর ফ্লাটে আমার সামনের টেবিলে তিনটি লোহার গুলি (মার্বেল সাদৃশ) পড়েছিল। আমি চোখ ছানা-বড়া করে তা দেখছিলাম ও মীরাজীর কথা শুনছিলাম। এ লোকটিকে প্রথমবার আমি এখানেই দেখেছিলাম। সম্ভবতঃ ১৯৪০ সালে আমি বোম্বে ছেড়ে সবে দিল্লীতে এসেছি। আমার মনে নেই এ লোকটি এক নম্বর ফ্লাটের আত্মীয় ছিল না, এমনিই চলে এসেছিল। তবে এতটুকু আমার মনে আছে তিনি রেডিও থেকে জেনে নিয়েছিলেন যে, আমি নিকলসন রোডের হাসান বিল্ডিং-এ আছি।

এই সাক্ষাৎকারের পূর্বে আমাদের মধ্যে মামুলী চিঠিপত্র আদান প্রদান হয়েছিল। আমি বোম্বেতে ছিলাম, তিনি 'আদবী দুনিয়ার' জন্য আমার কাছে একটা গল্প চেয়েছিলেন। আমি তার অভিপ্রায় অনুযায়ী লেখা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এই সঙ্গে লিখে দিয়েছিলাম এ লেখার পারিশ্রমিক অবশ্যই আমার চাই। এর জবাবে তিনি লিখেছিলেন, ঠিক আছে আমি লেখা ফেরত পাঠাচ্ছি। কারণ, 'আদবী দুনিয়া'র মালীক বিনে পয়সায় লেখা পেতে চায়। গল্পের নাম ছিল 'মওসুম কি শারারত'। তিনি আপত্তি জানিয়ে বসলেন শারারত (দুষ্টামি) শব্দের সাথে এ গল্পের কোন সম্পর্ক নাই। এ জন্যে নামটা বদলে নেয়া উচিত। আমি জবাবে বললাম, এ নামই এ গল্পর জন্যে প্রযোজ্য। আবাক হলাম, তুমি গল্প পড়ে তা বুঝলেনা। এরপর দ্বিতীয় চিঠি এলো। এই চিঠিতে সে তার নিজের ভুল স্বীকার করে নিল।

মীরাজীর লেখাছিল স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল। মোটা নিভের লেখা গোটা গোটা অক্ষরের লেখায় বেশ একটা আকর্ষন ছিল। সবচেয়ে

চমকপ্রদ ব্যাপার হলো আমি 'হুমায়ুন' সম্পাদক মওলানা হামেদ খানের হস্তক্ষরের সাথে তার লেখার সাদৃশ দেখলাম।

হাসান বিল্ডিং-এর এক নম্বর ফ্লাটে আমার সামনের টেবিলে ৩টা গুলি পড়েছিল আর গোলগাল এবং লম্বা চওড়া কাব্যের রচয়িতা মীরাজী খবই দশাসই এবং পোষাকী ভাষায় আমার সাথে কথা বলছিল। কথা হচ্ছিল আমার গল্প নিয়ে। তিনি না প্রশংসা করছিলেন, না কটাক্ষ—বরং সংক্ষিপ্ত আলোচনা বলা যায়। সহজ সরল সমালোচনাও বলা যায়। তার কথা শুনে মনে হলো আর যা হোক, এই লোকটির মাথায় কোন মাকড়সার জাল নেই। কথাবার্তায় কোন প্রচ্ছন্নতা ছিলনা। এ সব শুনে আমি সত্যি অবাক হয়েছিলাম। কারণ, অস্পষ্টতা এবং অধিক ভাবালুতার জন্য তার কবিতা বরাবর আমার কাছে দুর্বোধ্য ছিল। কিন্তু সেকেল সুরত এবং পোষাক আষাক-এর নিরিখে সে ছিল একই রকম—যেমন তার আমিত্রাক্ষর দুর্বোধ্য কবিতা। সত্যি, তাকে দেখে তার কাব্য কর্ম আমার কাছে আরো জটিল হয়ে উঠল।

ন, ম, রাশেদকে আধুনিক গদ্য কবিতার পথিকৃৎ বলা হয়ে থাকে। তাকেও এই দিল্লীতেই দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। মোটামুটি তার কবিতা আমার বোধগম্য হচ্ছিল আর এক নজর দেখে তার চেহারা সুরতও আমার কাছে সুস্পষ্ট হলো। তাই আমি রেডিও ষ্টেশনের বারান্দায় রাখা মাডগার্ড বিহীন সাইকেল দেখে তাকে রসিকতা করে বলেছিলাম, নাও এই হচ্ছে তোমার কবিত্ব এবং তুমি।' কিন্তু মীরাজী সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করতে পারলাম না। আমার মনে তার কবিতা সম্পর্কে অস্পষ্টতা ছাড়া আর কিছু রেখাপাত করেনি।

আমার সামনের টেবিলে তিনটি গুলি, নিছক গুলি পড়েছিল—সিগারেটের কাগজে মোড়ানো ৩টি গুলি। দুটো বড় একটি ছোট। আমি মিরাজীর দিকে তাকালাম, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল তার। চোখের ওপরে ঘন ভ্রূ আর তার ওপরে ঝাকড়া মাথা চুল। এও যেন তিনটি গুলি। দুটো ছোট ও একটি বড় (মাথা)। আমি এই সাদৃশ্যের কথা ভাবতেই আমার মনের প্রতিক্রিয়া মুচকি হাসিতে রূপান্তরিত হলো। মিরাজী অন্যের মনের প্রতিক্রিয়া আঁচ

করার বেলায় বেশ পটু ছিলেন। তিনি হঠাৎই তার মুখের কথা অসমাপ্ত রেখে আমাকে বললেন,

'কি ভাই হাসছ যে? কি হয়েছে বুঝতে পারলাম না।

আমি টেবিলের গুলি তিনটির দিকে ইঙ্গিত করলাম। এবার মিরাজীর পালা। তার পাতলা অধর প্রান্তের সরু গোঁফের সমন্বয়ে গোলাকার ধরণের একটা হাসি ফুটে উঠল মুখে।

তার গলায় মোটা গোল মাংকের মালা সুশোভিত। এই মালার শুধু উপরের অংশ কলারের ফাকে উঁকি মারছিল। আমি মনে মনে বললাম, লোকটি নিজেকে কি বিশ্রী চেহারার বানিয়ে রেখেছে। লম্বা লম্বা ময়লা চুল, ঘাড় অবধি লটকানো, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, ময়লা ভর্তি লম্বা নখ। শীতের সময় ছিল তখন, মনে হচ্ছিল এক মাসের মধ্যেও তার শরীরে পানির স্পর্শ পায়নি।

এটা তখনকার কথা, সাধারণতঃ কবি, লেখক এবং সম্পাদকরা তখন লণ্ড্রিতে নগ্ন বসে ডবল রেটে কাপড় ধোলাই করতো। এই জাতের লোকরা খুবই নোংরা জীবন যাপন করতো। তাই আমি ভাবলাম। এই মিরাজীও এদের মতোই একজন লেখক সম্পাদক। কিন্তু তার এই পুঁতি গন্ধময় শরীর, লম্বাচুল, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, গলার মালা এবং এই তিনটি আজগুবি গুলি—তার পেশার কোন ছাপ ছিলনা এতে। তার এই বেশভূষায় বরং সন্নাসী ও দরবেশের রূপ বেশী সুস্পষ্ট ছিল। এসব ভাবতেই হঠাৎ আমার রাশিয়ার রাসপুতিনের কথা মনে পড়ে গেল। কোথায় যেন পড়েছিলাম, সে নোংরা থাকতে বেশ পসন্দ করতো। বরং এ ভাবেও বলা যায় যে, এই নোংরামী সম্পর্কে তার কোন অনুভূতি ছিলনা। তার নখের মধ্যেও ময়লা ভর্তি থাকতো। খাবার শেষে তার আংগুলে ঝোল মশলা লেগে থাকতো। যখন তা সাফ করার ইচ্ছে হতো, পাশে উপবিষ্ট শাহজাদী এবং শেঠ কন্যাদের দিকে তা বাড়িয়ে দিতো। তারা নির্বিবাদে তা তাদের জিহবা দিয়ে চেটে নিতো।

সত্যিই কি মিরাজী এধরণের একজন দরবেশ ছিলেন? এ প্রশ্নটি সে সময়ে এবং পরে প্রায়ই আমার মনে ঘুরপাক খেতো। আমি অমৃতসরের ঘোড়াশাহ সাঁইকে দেখেছি—সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় সে বিচরণ করতো, কোন দিন স্নান করতোনা। তার মতো আরো কয়েক-

জন সাধু সন্যাসীকে আমি দেখেছি, যারা নোংরা থাকতেই পছন্দ করতো। এসব সাধু সন্নাসীদের আমি তেমন ঘৃনা করতাম না। মিরাজীর নোংরামীকেও আমি তেমন ঘৃণা করতাম না। তবে অস্বস্থি লাগতো বৈকি।

ঘোড়াশাহের কাবিল সাঁইর পারত পক্ষে চুপ থাকতোনা। তবে তার মুখে থেকে আমি কখনো কোন গালি শুনিনি। এ ধরণের সাধু সন্যাসী প্রকাশ্যে খুব রক্ষনশীল থাকেন, কিন্ত পর্দার অন্তরালে সর্বদা সব রকম যৌনকর্ম করে থাকেন। মীরাজীও রক্ষণশীল ছিলেন। কিন্ত তিনি তার যৌন তৃপ্তির জন্য শুধু মাত্র তার মন মগজের মধ্যেই সম্নোহিত ছিলেন। এদিক থেকে তার মধ্যে এবং ঘোড়াশাহের সাঁইদের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ রয়েছে বৈকি। তবে তার সাথে এদের পার্থক্য যেটা প্রধান, তাহলো এই তিনিটি গুলি। এই তিনটি গুলিকে নাড়াচাড়া করার জন্য বাইরের কোন বস্তুর সাহায্য তার নিতে হয় না। হাতের সামান্য নাড়াচাড়া এবং হালকা অনুভূতি মিশিয়ে তিনি এ তিনটি বস্তুকে উপর থেকে উপরে এবং নিচে থেকে নিচে পরিভ্রমন করিয়ে থাকেন। এই হাতের খেলার গোমর সম্ভবতঃ তাকে এই গুলি তিনটিই শিখিয়েছে সে গুলি তিনটি এক সময় পথের পাশে পড়েছিল। এই বাহ্যিক নাড়াচাড়াতেই অনাদি কালের সকল তত্ব নিহিত রয়েছে। প্রেম, সৌন্দর্য্য এবং মৃত্যু এই ত্রয়ী ভাবনার সকল আধ্যাত্মিক গূঢ় তত্ব তিনি এই তিনটি গুলির বদৌলতে লাভ করেছেন। কিন্ত প্রেম এবং সৌন্দর্য্যের পরিনাম যেহেতু তিনি পরাজিত চোখে ভগ্ন কাচের চশমা দিয়ে দেখেছেন বলেই তিনি তা সঠিক দেখেননি। এ জন্যে তার সমুদয় অস্তিত্বে এক অনির্বচনীয় দূর্বোধ্যতার হলাহল ছড়িয়ে ছিল—যা বিন্দু থেকে শুরু হয়ে বৃত্তে এসে স্থির হয়েছে। ঠিক তেমন করে, যেন এর প্রতি ইঙ্গিতে রয়েছে যেমন উন্মেষ তেমনি রয়েছে পরিসমাপ্তিও। এজন্যে এর দুর্বোধ্যতাটুকু নখদন্ত বিহীন। এর ধাবমানতা না জীবনের দিকে, না মৃত্যুর দিকে। সে তার শুরু এবং শেষকে এমন ভাবে মুষ্টি বদ্ধ করে রেখেছে যেন এ দু'য়ের রক্ত চুয়ে চুয়ে পড়ছে ফোটা ফোটা হয়ে। কিন্ত সরল পন্থীদের মতো সে এতে মুগ্ধ বিমোহিত নয়। এখানে এসে

তার আবেগ আবার তালগোল পাকিয়ে যায়—ঠিক যেমন এই তিনটি গুলির মতো, হাসান বিল্ডিং-এ যে তিনটি গুলিকে আমি প্রথমবার দেখেছিলাম। তার কবিতার চরণ ঃ

নগরী নগরী ফেরা মুসাফির ঘরকা রাস্তা ভুল গিয়া

নিরুদ্দেশ মুসাফিরের রাস্তা ভুল হবেই। কারণ, চলার শুরুতে পথে সে কোন দাগচিহ্ন অংকন করেনি। নিজের চলার সীমারেখার মধ্যে সে কয়েকবার ঘুরপাক খেয়েছে, কিন্তু তা তার খেয়াল নেই। আমি মনে করি, মীরাজী ভুলে বসেছেন তিনি মুসাফির, সফর, নাকোন রাস্তা। এই ত্রয়ী ভাবনা তার মন মেজাজকে আচ্ছন্ন করে ঘুরপাক খাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

মীরা নাম্নী এক মেয়েকে তিনি ভালবেসেছিলেন—এবং এভাবে সানাউল্লা থেকে 'মীরাজী' নাম ধারণ করেছেন। এই মীরার সুবাদেই তিনি মীরাবাইর গান ভালবাসতে শুরু করেন। এই প্রেমিকার দেহ পল্লব যখন আর তার নাগালে এলোনা, কুমারদের মতো মাটির প্রতিমা গড়ে তার পূজা করার ব্রত গ্রহণ করেন। তার ধ্যান ধারনা এবং চিন্তার মধ্যে মীরা লীন হয়ে মিশে গিয়েছিল। পরে এমন এক সময় এলো যখন যে কোন মেয়ের পা মীরার পা সাদৃশ, যে কোন নিতম্ব মীরার মতো এবং যে কোন পথচারী মীরার মতোই হেটে যেতে লাগল।

প্রথম দিকে মীরা 'বুলন্দবাম' মহল্লার দিকে থাকতো। মীরাজী এমন বিশ্রীভাবে পথভ্রষ্ট হলেন এবং নিমজ্জিত হতে লাগলেন যে, এই অধঃপাতের কোন খেয়াল খবর ছিলনা তার। কারণ, প্রতিপদে সে মীরার স্বপ্নে আচ্ছন্ন ছিল। প্রথম দিকে মীরা অন্যান্য প্রেমিকাদের মতো সুন্দরী ছিল। কিন্তু নারী পোষাক আচ্ছাদিত এই সৌন্দর্য্যের বেষ্টনী ছাড়িয়ে সে তার গভীরতম প্রদেশে অবতীর্ণ হলো এবং তা বিচ্ছেদে পর্যবসিত হলো একদিন।

সৌন্দর্য্য, প্রেম এবং মৃত্যু—এই ত্রৈয়ী দর্শন মীরাজীর অস্তিত্বকে এমন ভাবে অচ্ছেদ্য করে রেখেছিল যে, তার সুস্থ্য মন মানসিকতা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কখনো মনে হতো প্রথমে মৃত্যু, সৈন্দর্য্য পরে এবং মাঝখানে প্রেম, আবার কখনো প্রেম আগে, পরে মৃত্যু এবং সবশেষে সৌন্দর্য্য। এভাবে তার চিন্তাধারা ঘুরপাক খেতো দিনমান।

যে কোন মেয়ের সাথে প্রেম করার পরিণতি একই হয়ে থাকে। সৌন্দর্য্যে, প্রেম এবং মৃত্যু—প্রেমিক, প্রেমিকা এবং মিলন। সানা-উল্লার সাথে মীরার মিলন কোন দিন হয়নি, হতে পারেনি। এবং এই না হওয়ার বিমূর্ত চরিত্র ছিল এই মীরাজী। প্রেমে পরাজিত হয়ে এই ত্রয়ী অস্তিত্বকে সে আপন করে নিয়েছে—এতে তার মনে কিছুটা প্রশান্তি তো এসেছে।

প্রিয়ার মিলনের জন্যে এমন কোন শর্ত নেই যে, প্রিয়ার অস্তিত্ব থাকতে হবে। সে নিজেই প্রেমিক, নিজেই প্রেমিকা এবং নিজেই বিরহ মিলন।

আমি জানিনা সে এই লৌহ নির্মিত গুলি তিনটি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিল। নিজেই সংগ্রহ করেছে, নাকোন যায়গা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে তা জানা যায়না। বেশ মনে আছে, একবার আমি তাকে এ ব্যাপারে বোম্বেতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে সরাসরি জানিয়েছিল, 'এগুলো আমি তৈরী করিনি, এগুলো নিজে তৈরী হয়ে আমার কাছে এসেছে।'

বলে সে তার প্রথমে বড় গুলিটির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'প্রথমে এসেছে এটা, তারপর এসেছে দ্বিতীয়টা এবং সব শেষে শেষেরটি।' মেঝোটা এবং তার পরেরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। আমি মুচকি হেসে বললাম, 'তাহলে প্রথমে দেখা যাচ্ছে বড়টি, অর্থাৎ বাবা আদম আলাইহিস সালাম, আল্লা তাকে বেহেস্ত নসীব করুক, দ্বিতীয়টি হচ্ছে আম্মা বিবি হাওয়া, এবং তৃতীয়টি হচ্ছে এদের সন্তান।'

আমার এ কথা শুনে মীরাজী পেটপুরে হাসলো। ভাবতে গেলে এখনও আমার এই তিনটি অস্তিত্বের ওপর সারা বিশ্ব চরাচরের পরিক্রমা চোখে ভেসে ওঠে। এই ত্রৈয়ীর অপর নামই কি সৃষ্টি? জীবনের সাথে সম্পৃক্ত এই ত্রৈয়ী অস্তিত্বের বাইরে কি মানুষের সৃষ্টি শক্তির কোন চিহ্ন নেই?

খোদা, পুত্র এবং পরম আত্মা—এই হচ্ছে খৃষ্ট ধর্মের মূল উৎস। মহাদেবের ত্রিশুল শিরদেশ। তিন দেবতা—ব্রহ্ম, বিষ্ণু এবং ত্রিলোক—আকাশ, মাটি এবং পাতাল। শুষ্ক, আর্দ্র এবং বাতাস। তিনটি মৌলিক রং হচ্ছে লাল, নীল এবং হলুদ। আমাদের ধর্মীয় অনুশীলনের দিকেই তাকানো যাক না কেন, অজুতে তিন

তিনবার ধুতে হয়। তিন তালাক, তিন মোআনেকা। জুয়াতে রয়েছে তিন কানি। সঙ্গীতে রয়েছে প্রধান তিনটি তাল। মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক তলিয়ে দেখলে আরো পাওয়া যাবে এমনি ত্রৈয়ী অস্তিত্বের সন্ধান। মানুষের জন্ম সংক্রান্ত ক্রিয়া কলাপেও তিনটি প্রধান অঙ্গ সক্রিয়।

মীরাজীর সাথে প্রথম সাক্ষাতেই আমি অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছিলাম। সে একবার দিল্লীতে আমাকে বলেছিল, রেডিওর নির্জন স্টুডিওতে সাধারণত তার যৌন উত্তেজনার উদ্রেক হয়ে থাকে এবং বিকল্প পন্থায় সে তা নিবৃত্তি করে থাকে। তার এই যৌন বিকৃতি তার দুর্বোধ্য কবিতা প্রসূত বলেই আমার মনে হয়েছে। সাধারণ কথা-বার্তায় তিনি পরিষ্কার মস্তিষ্কের পরিচয় দিতেন। তিনি চাইতেন, তার জীবনে যা কিছু ঘটেছে তা কবিতায় প্রকাশ পেয়ে থাক। কিন্তু বিপদ হচ্ছে, এ ব্যাপারে তিনি সচেতন ছিলেন। নিজের অক্ষমতা তিনি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতেন। কিন্তু নিজের অক্ষমতাকে তিনি সাধারণ লোকদের মতো বিশেষ রং-এ চিত্রিত করার চেষ্টা করতেন এবং ধীরে ধীরে সেই মীরাকেও নিজের ভ্রষ্ট চিন্তার গুলিতে চড়িয়ে দিলেন।

কবি হিসাবে তাকে তামাক পাতার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আমি মনে করি তার কবিতা উৎকৃষ্ট মানের তামাকের গুড়ো। একদিন না একদিন তার এই কবিতার মাহাত্ম্য সাধারণ্যে বেরিয়ে পড়বেই। আসলে তার কবিতা হচ্ছে একজন পথভ্রষ্ট মানুষের বাচন, যা মানবতার গভীর কন্দরের সাথে সম্পৃক্ত থাকা সত্ত্বেও শুধু অপরদের জন্যেই শূন্যে ফানুস উড়িয়ে থাকে।

মানুষ হিসাবে তিনি একজন চমকপ্রদ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। একেবারে নিম্নস্তরের আন্তরিকতা সম্পন্ন—তার এ দুর্লভ গুনটি সম্পর্কে নিজের কোন সচেতনতা ছিলনা। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে, যেসব লোকেরা নিজেদের দৈহিক ইচ্ছাকে নিজেদের হাতে সপে দেয়, তারা সধারণতঃ এ ধরণের আন্তরিক হয়ে থাকে।

এতে কোন সন্দেহ নেই, এভাবে লোকেরা আসলে নিজেদের ধোকাই দিয়ে থাকে। তবুও এতে আন্তরিকতা আছে, এইটুকুই বড় সান্ত্বনা।

মীরাজী কবিত্ব করেছেন খুব আন্তরিকতার সাথে, মদপান করেছেন, তাও আন্তরিকতার সাথে। ভাঙ্গ খেয়েছেন তাতেও আন্তরিকতার কোন ফাঁক ছিলনা। মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করেছেন এবং প্রতারিত হয়েছেন দারুণভাবে। জীবনের সবচাইতে বড় আকাংখা তার প্রজ্জলিত হয়েছে এভাবে, এভাবে নিশেষিত হওয়ার পর অন্য কারো কাছ থেকে প্রতারিত হওয়ার মতো অবস্থা আর তার ছিলনা। এরপর তিনি একজন হার্মলেস মানুষে পরিণত হয়েছেন, নিরুদ্দেশ জীবনের পেছনে ঘুরেছেন দিনের পর দিন। একজন পথ ভ্রষ্ট পথিকের মতো ঘুরে বেরিয়েছেন পথে প্রান্তরে, নগরে। পথে পথে তার গন্তব্য তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে, কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি এগিয়ে গেছেন অবলীলাক্রমে।

আমি মীরাজীর কাব্য কর্ম সম্পর্কে মাত্র দু' তিনটি কথা বলেছিলাম। আমি এসবকে 'আবোল তাবোল' বলে আখ্যায়িত করেছি। তিনিও তা স্বীকার করতেন। এই তিনটি গুলি এবং গলায় পরিহিত মোটা দানার মালাকে আমি 'ফ্রড' বলতাম, তিনিও তাই মানতেন। অথচ আমরা দু'জনেই জানতাম, আসলে তা ফ্রড নয়।

একবার তার হাতে তিনটির বদলে মাত্র দু'টি গুলি দেখে বিস্মিত হলাম। এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে বললেন, 'জ্যেষ্ঠ বেচারী ইন্তেকাল করেছে। কিন্ত সঠিক সময়ে আরেকজনের জন্ম হবে।'

আমি যতদিন বোম্বেতে ছিলাম, দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ গুলি মহোদয়ের আর আবির্ভাব হয়নি। হয় আম্মা হাওয়া অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন অথবা বাবা আদম পৌরুষহীন হয়ে পড়েছিলেন। অতএব এই ত্রৈয়ী ব্যাপার স্যাপার শেষ হয়ে গেল। এটা এক অশুভচক্র ছিল। আমি পরে জানতে পারলাম, মীরাজী এ ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। অতএব শুনতে পেলাম তিনি নিজ হাতে বাকী দুটোকে আলাদা করে দিয়েছেন।

মীরাজী কিভাবে যেন ঘুরতে ফিরতে বোম্বেতে এসে পৌছলেন আমি এসময় ফিল্মিস্তানে কাজ করতাম। যখন তিনি আমার সাথে দেখা করতে এলেন, খুবই বিপন্ন অবস্থা ছিল; সেই গুলি তিনটি তেমনি হাতে ছিল। বগলদাবা করে কবিতার খাতাও নিয়ে এসেছেন। তাতে মীরাবাইর কবিতা নিজের হাতে লিখে

নিয়েছেন। সঙ্গে একটা আজব ধরণের বোতলও রয়েছে। বোতলের মুখ একদিকে ঘুরানো। যখনই নেশা পায় তা থেকে ঢেলে গলধ-করণ করেন।

মুখে দাড়ি ছিল না। মাথার চুল পাতলা। সারা গায়ে ময়লা দুগন্ধ ভন ভন করছিল। পায়ের চপ্পল একটি ভাল ছিল, অপরটি মেরামতের প্রয়োজন ছিল। সেটাকে রশি দিয়ে বেঁধে আপাতত কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। কিছুক্ষণ একথা সেকথা হলো। সম্ভবতঃ তখন 'আটদিন'-এর স্যুটিং চলছিল। ছবির কাহিনী ছিল আমার। ছবির দু'একটি গানের প্রয়োজন ছিল। তাই ভাবলাম দু'টো গান যদি মীরাজীকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়া যায় তাহলে তিনি ক'টা টাকা পেয়ে যাবেন। তাকে বলা হলে তিনি সেখানে বসে বসেই গান দুটো লিখে দিলেন। কিন্তু ভাষা কেমন যেন বিদঘুটে, ভাবালু তায় ভরা—ছবির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অচল। আমি আমার মতামত ব্যক্ত করার পর তিনি চুপ থাকলেন। যাবার সময় তিনি আমার কাছ থেকে সাতটি টাকা চেয়ে নিলেন, কিছু একটা কিনতে হবে তার।

এরপর থেকে ফি রোজ তাকে সাড়ে সাত টাকা দেয়া আমার যেন কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু আমি ছিলাম বোতলের পাগল। এই বস্তু মুখে একটু না পড়লে মনটা চাঙ্গা হতোনা। তাই যে ভাবে হোক পয়সাটা জোগাড় করে রাখতে হতো। এক বোতল রমের দাম সাতটাকা এবং আসতে যেতে আট আনা।

বর্ষার মওসুম এলো। বর্ষাতে তার ভীষণ অসুবিধা হলো। বোম্বেতে একবার এত বৃষ্টি হলো যে, মানুষের হাড়ে পর্য্যন্ত যেয়ে তা বিঁধল। তার কাছে বাড়তি কোন কাপড় ছিল না। এজন্যে বর্ষার সময়টা তার ভীষন কষ্টে কেটেছে। আমার কাছে একটা বর্ষাতি ছিল— এক সৈনিক বন্ধু এটা আমার কাছে ফেলে চলে গিয়েছিল, যেহেতু ওটা ভীষন ভারি ছিল।

আমি মীরাজীকে এই ভারি বর্ষাতিটা সম্পর্কে অবহিত করলাম। মীরাজী বললেন, 'ঠিক আছে, যত ওজন হোক, আমি তা বহন করতে পারব।' অতঃপর আমি তাকে ওটা দিয়ে দিলাম এবং পুরো বর্ষা তিনি ওটা বহন করে চললেন।

মরহুম সমুদ্র বড় ভাল বাসতেন। আমার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় আশরাফ তখন পাইলট হিসাবে কাজ করতো। থাকতো সমুদ্র তীরে জুহর দিকে। মীরাজী তার ওখানেই থাকতো। তার সাথে মীরাজীর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। জানিনা এই বন্ধুত্বের কারণ কি ছিল। পাইলট কোন দিন কাব্য সাহিত্য পছন্দ করতো না। আশরাফ যখন ঘরে থাকতো না, মীরাজী সমুদ্রের বালুকা বেলায় বর্ষাতিটা বিছিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে যতসব দুর্বোধ্য কবিতার কথা চিন্তা করতেন। এসময় প্রতি বোরবার জুহুতে যাতায়াত করা আমার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। আমরা দু'তিনজনে মিলে সমুদ্রের তীরে বেরিয়ে পড়তাম এবং সারা দিনমান ঘুরে ফিরে কাটাতাম। ঘুরতে ফিরতে মীরাজীর সাথে দেখা হয়ে যেতো—তিনি আজব ধরনের ভাবাবিষ্ট থাকতেন। আমি এসময় ভুলেও কাব্য সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতাম না। তীরের তিন চতুর্থাংশ জুড়ে উলংগ নারী পুরুষদের দেখতাম দু'চোখ ভরে। নারিকেল পানির সাথে মদ মিশিয়ে খেতাম এবং এক সময় মীরাজীকে রেখে চলে আসতাম।

আশরাফ কিছু দিন পর মীরাজীকে একটা আপদ মনে করতে লাগল। তার পানাভ্যাস ছিল, কিন্তু তা মাত্রাতিরিক্ত নয়। মীরাজী এ ব্যাপারে সীমারেখা ছাড়িয়ে যেতেন বলে আশরাফের অভিযোগ ছিল। খেতে খেতে পাঁড় মাতাল হয়ে পড়তেন, তারপরও আরো চাইতেন।

তার মদ্যপানের এই ব্যাপারটা আমি জানতাম না। কিন্তু আমি একদিন টের পেয়ে গেলাম। সেকথা মনে পড়লে আজও আমার কেমন কেমন লাগে।

প্রচণ্ড বর্ষা চলছিল। এমনকি এতে ট্রাম গাড়ীর চলাচল পর্য্যন্ত বিঘ্নিত হয়ে পড়েছিল। শহরে মদের দোকান বন্ধ ছিল। কেবল মাত্র বান্দ্রাতেই তখন সঠিক দামে এই বস্তুটি পাওয়া যেতো। মীরাজী আমার সাথে ছিলেন। আমার পুরনো বন্ধু হাসান আব্বাসও ক'দিন আমার সাথে কাটাবার জন্যে দিল্লী থেকে এসেছে। আমরা বান্দ্রাতে পৌছে দু' বোতল রম নিলাম। ষ্টেশনে আসতেই রাজা মেহদী আলী খানের সাথে দেখা। আমার স্ত্রী লাহোরে ছিল। এজন্যে ঠিক করলাম মীরাজী ও রাজা রাতে আমার ওখানেই থাকবে।

রাত একটা অবধি রম চলছিল। রাজার দু'পেগই যথেষ্ট। দু'পেগ শেষ করে সে এককোনে বসে ছবির গান লেখার প্রাকটিস করছিল। হাসান আব্বাস ও মীরাজী ততক্ষনে আবোল তাবোল বকতে শুরু করেছে। কারফিউ ছিল বলে বাইরের পথঘাট জনমানবহীন ছিল। আমি বললাম, এবারে শোয়া যেতে পারে। আব্বাস এবং রাজা তাতে সায় দিল। মীরাজী কিন্তু তাতে সম্মত হলোনা। তিনি আঁচ করছিলেন, এখনও মদ রয়েছে বোতলে। তিনি আরো মদ চাইলেন। আমি এবং আব্বাস জেদ ধরলাম। কোন মতেই তাকে আর মদ দোবনা ঠিক করলাম। মীরাজী প্রথম অনুনয় বিনয় করলেন, পরে হুকুম দিতে লাগলেন। আমি এবং আব্বাস তাকে এমন সব কথা শোনালাম, যা মনে পড়লে আজও লজ্জা পাই। লড়াই ঝগড়া করে আমরা অন্য কামরায় চলে গেলাম।

আমার খুব ভোরে ওঠার অভ্যেস। ঘুম থেকে উঠেই পাশের কামরায় গেলাম। আমি রাতে রাজাকে বলেছিলাম মীরাজীকে ট্রেচার পেতে দিতে এবং সে যেন সোফাতে শোয়। রাজা ট্রেচারে সটান শুয়েছিল। কিন্তু শোফাতে মীরাজী নেই। আমি অবাক হলাম। গোসলখানা এবং বাবুর্চি খানায় দেখলাম। সেখানে তাকে পেলাম না। ভাবলাম হয়ত তিনি রাগ করে চলে গেছেন। আমি ব্যাপারটি জানার জন্য রাজাকে জাগালাম। সে জানাল মীরাজী সোফাতেই শুয়েছিল। রাতে আমরা শুয়ে কথা বার্তাও বলেছি কিছুক্ষন।

শেষে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল তিনি রাজা মেহদী আলীর ট্রেচারের নীচে ফ্লোরে শুয়ে আছেন। ট্রেচার তুলে তাকে বের করা হলো। রাতের ঘটনাবলী সবার মনে উদয় হলো। কিন্তু কেউ কোন কথা বললোনা। মীরাজী আমার কাছে আট আনা পয়সা চাইল এবং ভারী বর্ষাতিটা কাঁধে ফেলে বাইরের দিকে পা চালিয়ে দিল। আমি মনে খুব দুঃখ পেলাম। রাতের অপ্রীতিকর ব্যাবহারের জন্য আমি অনুশোচনায় মরে যেতে লাগলাম।

এরপরও মীরাজী যথারীতি আমার কাছে আসা যাওয়া করত। চিত্র শিল্পের নাজুক অবস্থার কারণে আমিও অনেকটা রিক্ত হস্ত হয়ে পড়লাম। প্রতিদিন মীরাজীর মদের পয়সা জোগানো আমার জন্যে দুষ্কর হয়ে পড়ল। কিন্তু মুখ ফুটে আমি কিছু বললাম না।

কিন্তু সে টের পেলো। তাই একদিন সে মদ ছেড়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করে 'ভাঙ্গ' খেতে শুরু করল।

ভাঙ্গ-এর ব্যাপারে আমি খুব ঘৃণা পোষন করতাম। দু' একবার এ বস্তুটা খেয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে ভীষণ ঘেন্না ধরে গেছে। এ ব্যাপারে কথা তুললে মীরাজী বললেন, না, এটা তেমন খারাপ কি, এটার আলাদা বৈশিষ্ট আছে। এভাবে তিনি ভাঙ্গ সম্পর্কে রীতিমত একটা লেকচার ঝাড়লেন। কিন্তু মাথামুণ্ড তার কিছুই মনে নেই আমার। কারণ, আমার মাথায় তখন 'আট দিন' ছবির একটি কঠিন দৃশ্যের কাজ ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমার মাথায় এক সময় একটা না একটা কাজ নিয়েই থাকে। এজন্যে সে কথা বলছিল আর আমি কাহিনী নিয়ে ভাবছিলাম।

ভাঙ্গ খেলে আসলে মস্তিষ্কে কেমন লাগে? আমার যতটুকু মনে হয়, চার দিকের জিনিষপত্র হয় ছোট, নয়ত বড় আকার ধারন করে। মানুষ সীমা ছাড়িয়ে ধীশক্তি সম্পন্ন হয়ে পড়ে—কানের মধ্যে এমন কোলাহল শুরু হয় যে, মনে হয় একটা লোহার কারখানা খুলে দেয়া হয়েছে তাতে। তখন সামান্য পানির রেখাকে মনে হয় নদী, এবং নদীকে মনে হয় এক চিলতে পানির রেখা। মানুষ তখন হাসতে শুরু করলে হাসতেই থাকে, আবার কাঁদতে শুরু করলে কোন ক্রমেই থামানো যায়না।

তবে মীরাজী ভাঙ্গ খাওয়ার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমাকে যা বলেছেন তার সাথে এর ততটা মিল নেই। ভাঙ্গ নেশার সময় তিনি বেশীর ভাগ ঢেউ-এর কথা বলতেন।···নাও, আবার একটু গোলমাল মনে হচ্ছে···একটা বস্তু চারদিকের বস্তুর সাথে মিলে গিয়ে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। আবার নিচে নেমে আসছে। আবার তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে এসব···আবার আস্তে আস্তে সামনের দিকে আসছে, মস্তিষ্কের শিরার মধ্যে কিলবিল শুরু করছে। ছটফট শুরু হয়েছে···তবে এবার খুব মসৃনভাবে। এবারে একটা গুন গুন সুর তুলেছে···ধীরে ধীরে···মনে হয়ে নরম বিড়াল চলছে বড় আয়েশী ভঙ্গিতে···উহু—এবারে তীব্র আওয়াজে 'মেঁও' শব্দ হলো আর ঢেউ খান খান হয়ে গেল, হারিয়ে গেল।

আমার বেশ মনে আছে, আমি তাকে এসব ঘটনাবলী হুবহু তার কবিতায় বর্ণনা করতে বলেছিলাম, তিনি কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু এদিকে তাকে মোটেই ঝুঁকতে দেখিনি।

খুঁটে খুঁটে আমি কারো কাছে কিছু জানতে চাই না। স্বাভাবিক কথাবার্তার মধ্যে আমার এবং মীরাজীর ভাববিনিময় হতো। কিন্তু সঠিক বিষয়বস্তুর মধ্যে কখনই তাকে টেনে আনা যেতনা। একদিন কথায় কথায় কেমন করে যেন তার যৌন উপসর্গ সম্পর্কে কথা উঠল। তিনি আমাকে বললেন, আজকাল এ ব্যাপারে বাহ্যিক বস্তুর সাহায্য নিতে হয়। 'উদাহরন স্বরূপ, এমন দু'খানি নধর পা যা দিয়ে ময়লা ঠেলে দেয়া হচ্ছে···রক্তাক্ত এবং নিরব নিথর।'

এসব শুনে আমার মনে হলো মীরাজীর বিকৃতি এমন একটা পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, তিনি অকল্পিত পথে যৌন সম্ভোগের চিন্তা করেন। ভালো হলো, তিনি তাড়াতাড়ি মারা গেলেন। কেননা, তার জীবনের বিকৃতি আরো একধাপ বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলোনা। যদি তিনি আরো কিছু কাল বাদে অক্কা পেতেন তাহলে এই মৃত্যুটাও এক দুর্বোধ্যতায় আচ্ছন্ন থাকতো।

মোস্তফা হারুণের অন্যান্য বই সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা

উদূ-সাহিত্য অনুবাদের ক্ষেত্রে মোস্তফা হারুণের অভিজ্ঞতা প্রায় দেড় যুগের। তাঁর অনুবাদ তাই এতো স্বচ্ছ এবং স্বাধীন···তিনি অনুবাদকে একটি শিল্প-কর্ম হিসাবে গণ্য করেন।

—২২. ৫. ৭৬. দৈনিক আজাদ

·····তাঁর অনুবাদে মৌলিক লেখার স্বাদ পুরোপুরি বজায় থাকে, এই সুনাম তিনি এক্ষেত্রেও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। —২২. ৭. ৭৬. পূর্বানী

·· ···প্রখ্যাত অনুবাদক মোস্তফা হারুণের অনুবাদ গুনে প্রতি লাইন মৌলিক লেখা বলেই মনে হয়। —দৈনিক সংবাদ

Mr Mustafa Haroon has done the job of literary rescue. His translation is competent and retains the flavour of the original. —Bangladesh Obserber

·····বইটির কভার আকর্ষণীয় ও অনুবাদ ঝরঝরে।

—দৈনিক ইত্তেফাক

স্বনামধন্য অনুবাদক মোস্তফা হারুণ বরাবরের মতোই এবারেও স্বচ্ছল ও সুন্দর অনুবাদ করেছেন। —সপ্তাহিক পূর্বানী

গাঙে ফেরেশতের কভার এবং বাঁধাই উন্নতমানের। স্বনামধন্য অনুবাদক মোস্তফা হারুণের অনুবাদ স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল।

—দৈনিক বাংলা

মোস্তফা হারুণ দক্ষ হাতে 'ভগবানের সাথে কিছুক্ষণ' অনুবাদ করেছেন। —১১. ৩. ৭৬. বিচিত্রা

আজকাল যেখানে কৃষণ চন্দর, মান্টো, খাজা আহমদ আব্বাস, সেখানেই মোস্তফা হারুণের দেখা মেলে। উর্দূ গল্পের অনুবাদ বলতে এখানে যে ৩/৪ জন লেখকের কলম সক্রিয় তাদের মধ্যে মোস্তফা হারুণ বিশেষভাবে চিহ্নিত এক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। সাবলীল ও লিটারারী ফ্লেভার সমৃদ্ধ অনুবাদ বলতে যা বুঝায় জনাব হারুণের লেখা ঠিক তা-ই। —মে' ৭৭ মাসিক নিপুন

'আমি গাধা বলছি' কৃষন চন্দরের একটি প্রতীকী উপন্যাস। অনুবাদ করেছেন মোস্তফা হারুণ। অনুবাদ স্বচ্ছন্দ।— ১৬ই মে '৭৭ বিচিত্রা

মোস্তফা হারুনের অনুবাদ স্বচ্ছন্দ ও সুকৃত হয়েছে।

—২৩. ৭. ৭৬. চিত্রালী